জুন ১৯৭৮ আষাঢ় ১৩৮৫

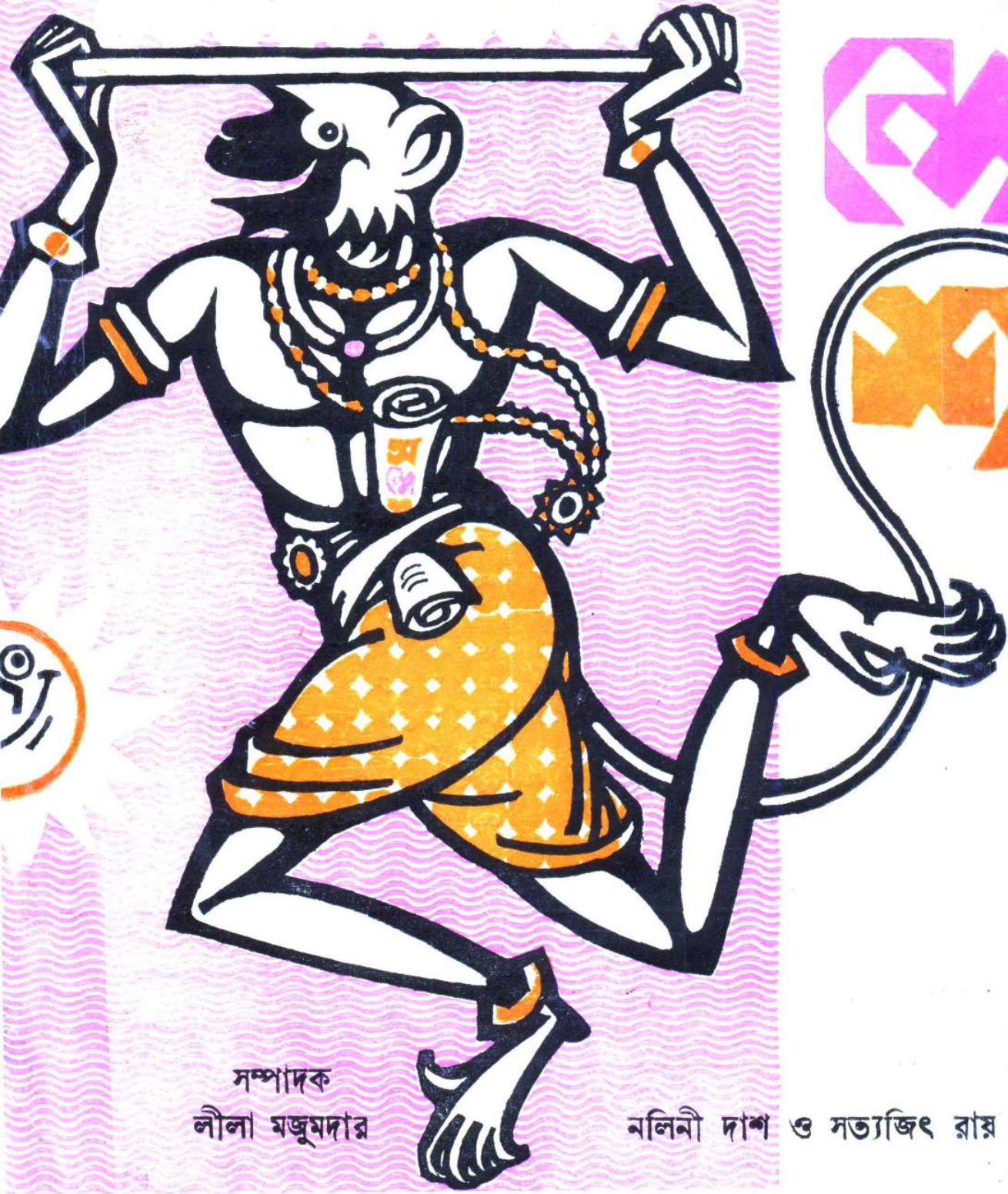

সম্পাদক
লীলা মজুমদার

নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

আষাঢ় ১৩৮৫

লীলা মজুমদার - নলিনী দাশ
ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

পৃষ্ঠা

১। খোকন বঙ্গে—গৌরী ধর্মপাল
২। আষাঢ়ে গল্প—লীলা মজুমদার
৫। বৃষ্টিতে কলকাতা—বিশ্বপ্রিয়
৬। আসল টেনিদা—আশা দেবী
১১। চিংড়ি-বগার কথা—শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। দুঃস্‌স্‌স্‌স্বপ্ন—উইনসর ম্যাক্‌কে
১৩। ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে—সত্যজিৎ রায়
২০। যেমন মা তেমনি ছা !—কিষনকান্তি শতপতী
২১। শিকার—প্রণব মুখোপাধ্যায়
২২। রথের মেলা—গোপালী নন্দী
২২। বর্ষা বিন্যাস—অসিতবরণ হাজরা
২৩। গল্পসল্প—লীলা মজুমদার
২৪। ছড়া—বসন্ত গোস্বামী
২৫। মহিষ দেবতা—বেনু গঙ্গোপাধ্যায়
২৭। রাতবিরেতে—সুবীর রায়
৩১। প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর—জীবন সর্দার
৩৩। চিঠিপত্র—
৩৫। হাত পাকাবার আসর
৪২। শমিলা স্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল
৪৩। কিলিমাঞ্জারো—গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়
৫১। স্মৃতি সৌধ—জীবনকৃষ্ণ ঘোষ
৫৪। মজুরী—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫। কোন পাখি ?—শচীন্দ্রনাথ দরিপা
৫৫। লেজ কাটলে ?—শচীন্দ্রনাথ দরিপা
৫৬। খেলাধুলা—অভয় হোম

সন্দেশ কার্যালয়	নিউস্ক্রিপ্টের দোকান	হাওড়া	প্রধান পরিবেশক
১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-৪৯১১	এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭	এলাকায় রবীন বর্মণ	নারায়ণ সাহা ১৭/১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩

দক্ষিণ কলকাতায়—রঞ্জিত ব্যানার্জি, প্রশান্ত নন্দী

আষাঢ় ১৩৮৫
জুন ১৯৭৮

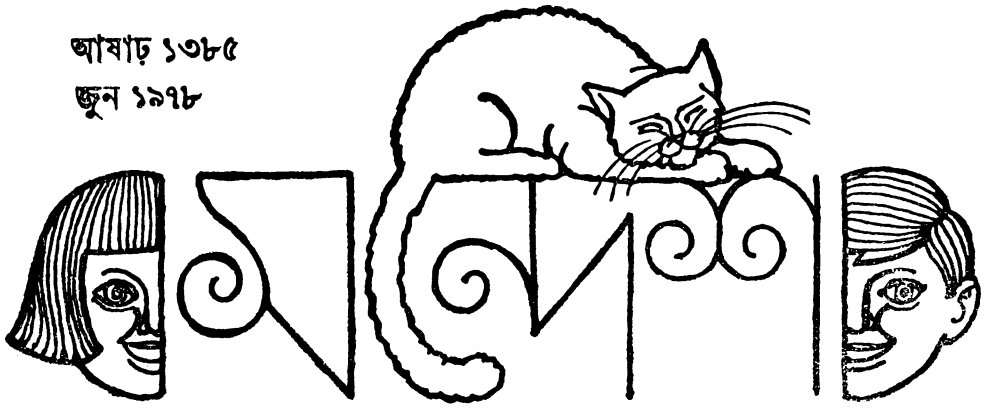

খোকন বলে

গৌরী ধর্মপাল

খোকন বলে কেবল তুমি
ছবি আঁকই ছবি আঁকই
গল্প মা কই গল্প মা কই ?
গল্প খাব গল্প যাব
গল্প নিয়ে খেলা করব
জল পড়ে পাতা নড়ে
গল্পতলায় গল্প ঝরে
শনশনিয়ে গল্প বয়
ধানের মাথায় গল্প হয়
তিনকোণা ঐ পাতার 'পরে
লাল সাদা ছিট গল্প পড়ে
গল্পক্ষেতের আলের ধারে একটুখানি বসি
গল্প দিয়ে ঘর ছেয়েছ কে গো তুমি চাষী ?
আয় গল্প ঝেঁপে
ধান দেব না-মেপে
এপারেতে কালো রং
পদ্য পড়ে ঝমঝম
ও পারেতে গল্পগাছটি রাঙাটুকটুক করে
মৌনবতী মা আমার মন কেমন করে।

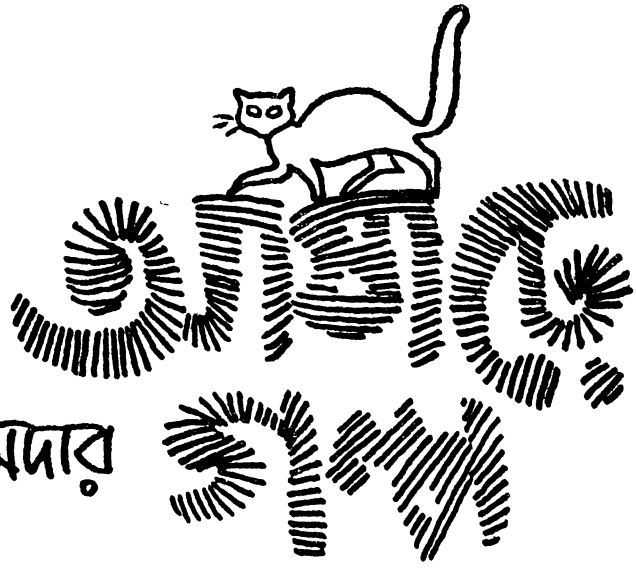

লীলা মজুমদার

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন শুরু হল গল্প। বর্ষা এই এল বলে, গরম তো নয় অল্প। গাঁ সুদ্ধু সকলের মেজাজ বিগ্‌ড়ে আছে, কথায় কথায় রাগ।

সন্ধ্যেবেলায় বড় ডাঙার মাঠে, কাঁচা এক বেল ঠেঙিয়ে ফুটবল খেলার পরে, বগাই, দামু, টপ্পা, ভোঁদা, মাইকেল, নেপু, নাদু, করকরি, কোটা, মণি, আলি ইত্যাদি দশ-বারোজন ঝগড়া করছিল। এমন সময় গয়লানী-মাসি এসে কেঁদে পড়ল,

'ওরে বগা দামু টপ্পা ভোঁদা বল্ দিকিনি,
কেলে ধলা পাটকিলে ননী পুষি মিনি,
ছ-জনার একটিকেও দেখতে কেন পাচ্ছিনি ?
খাবি দাবি ল্যাজ নাচাবি কাজের বেলা কাঁচকলা,
এই কথাটা নরম করে একবারটি যেমনি বলা—

শুনেই সবাই খাট থেকে, মোড়া থেকে, সাফ কাপড়ের ঝোড়া, থেকে খেয়ে, দেয়ে যে যেখানে শুয়েছিল, অমনি হঠাৎ সেখান থেকে সটাং দিলি, এমনি লক্ষীছাড়া ! আমি হেথা উপবাসী হেঁপো কাশি সারাদিন বিরাম-বিহীন খুঁজে খুঁজে সারা ? একবারটি যা দিকিনি, খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আয়, নইলে আমার পেরাণ যায়। লেবু চিনি মাঠা দিয়ে দেব খেতে মস্তপানা ঘটি ভরে, মাণিক ওরে, সন্ধ্যেবেলায় যে জায়গাতে যেতে নেই, ভালো করে, সে-সব জায়গা আয় তো দেখে, বাবাজীবন

সোনা মানিক, চোখের মণি, বুকের ধন !

বেড়াল ছেড়ে কেমন করে বেঁচে থাকি বল্ এখন !' মাসি থেমে হাঁপাতে লাগল। তারপর আবার বলল, 'বল্ আমারে, বেড়াল ছেড়ে দুঃখী কভু থাকতে পারে ?'

ব্যস্, ওদের ঝগড়া থেমে গেল, যেন আগুনে কে জল ঢালল। নেপো বলল, 'দেবে তো ঠিক, বল মাসি, কিন্তু তুমি দুঃখী শুনে পাচ্ছে হাসি। আমরা আছি বারোজনা, তায়, নাদু একটু বেশি

করেই খায়।'

মাসি জিব্ কেটে বলল,

'দোব, দোব, দোব! এবার ওঠ্ দিকিনি, খুঁজতে বেরো। সন্ধ্যে লাগলেই খায় যে ওরা, বল্ তো বাবা, এ কি গেরো! মাঠা তো দেবই তোদের, আখের গুড় দিয়ে ছানা মেখে দেব, বাছারা আমার ছানা মুখে দেয় না।'

আর দেখতে হল না। যে যেখান থেকে পারল লাঠি-সোঁটা, গোটা গোটা গাছের ডাল চেঁচেছুলে, কাঁধে তুলে, রওনা দিল। তাই দেখে মাসির এদিকে চক্ষু-স্থির! ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'মারিস্‌নে বাপ, লাগবে ওদের। বলছি তোদের, বড্ড নরম গা। কাজ করে তো অভ্যেস নেই, আদুরে শরীল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাড়িয়ে আনিস্। যাই তোদের মাঠায় লেবু গুলি গিয়ে।'

আর কি ওরা থাকে সে বাটে। সোজা গেল মাছ ধরুনির ঘাটে। যেখানে জেলেরা ডিঙি উপুড় করে, সেখানকার মাটি শ্যাল কুকুরে চাটে। সেইখানেই মাসির বেড়াল পাওয়া যাবে। রোজ রোজ ক্ষীর মাখন দুধ সর খেয়ে খেয়ে সব এমনি ফুলেছে যে কেউ গাছে চড়তে পারে না। তাই বেল-তলায় কি শ্যাওড়া-বনে খুঁজে লাভ নেই দূরও অনেক।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই! ঘাটের কিনারায় কটি আঁশ পড়ে ছিল। সাদা, কালো, ছাই, হলুদ, ছোপ-ধরা আর ডোরা কাটা ছটি মোটা মোটা বেরাল তাই শুঁকে হন্যে হচ্ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে তাদের পাথর-বাটিতে ক্ষীর মোয়া খেয়ে অভ্যেস।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম উপর নিচ এ-পাশ ও-পাশ, এই বারো দিক থেকে লাঠি-সোঁটা নিয়ে যখন বারোজন রে-রে-রে-রে করে ছুটে এল, তখন তারা পালাবার পথ পায় না। খালি এক জায়গায় ইচ্ছে করে একটু ফাঁক রাখা হয়েছিল; বুদ্ধি তো নয় কম। নেপুর আর নাদুর মধ্যিখানের সেই ফাঁকটি দিয়ে সাঁই-সাঁই করে ছয় বিল্লি হাওয়া!

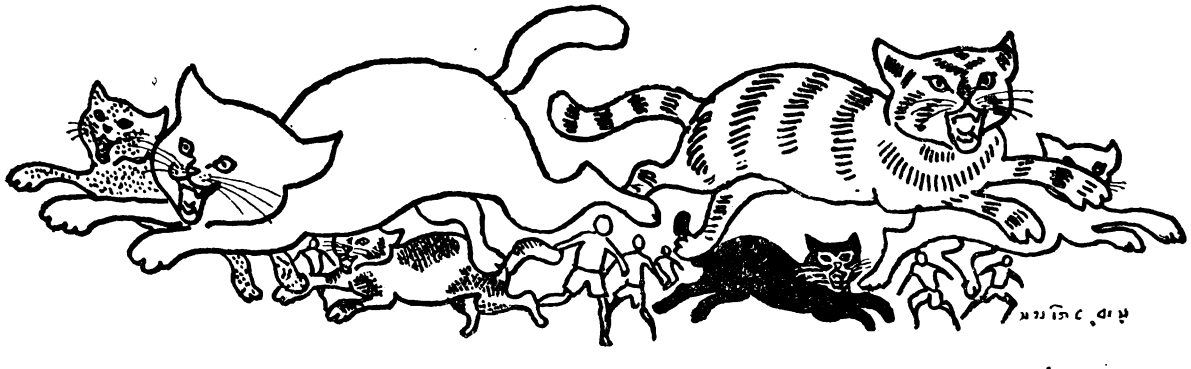

মিয়াও—মিয়াও করে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে তারা একেবারে গাঁয়ের মধ্যিখানে পৌঁছে গেল। আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ-ঝাড়, নালা-নর্দমা, খানা-খন্দ, আস্তাকুঁড় আর ছাই গাদা থেকে, দলে দলে পাঁশ-কুড়ুনি, উনুনমুখো, হাঁড়ি-খেকোরা যে যেখানে ছিল নিজেদের মধ্যেকার বারোমেসে

ঝগড়াঝাটি ভুলে,

সরু-মোটা, লম্বা বেঁড়ে, ঝাঁকড়া-ন্যাড়া ল্যাজ না তুলে,
নানান্ সুরে নানান্ স্বরে গলা ছেড়ে,
হৈ হৈ দ্দুদ্দাড় হাঁচড়-পাঁচড় এল তেড়ে।

এক দিকে— 'খেউ খেউ খেউ খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্
ও দাদা! এবার মজা ছাখ্ ছাখ্ ছাখ্?'

আর অন্য দিকে— 'মিঁ-য়া-ও ফ্যাঁশ্—ফোঁশ্?
এলাম বলে! একটু রোস্!
খচর-খাচর, মারব আঁচড়,
ফেলব ছিঁড়ে আমি আগে!
—ই-কি দাদা! কোথায় ভাগে?'

তখন গয়লানী-মাসির সেই ছয়টা আহ্লাদে বেড়াল, যারা কাজ কম্ম করে না, শুধু খায় আর ঘুমোয়। আলো পড়লেই যাদের চোখের কপাট বন্ধ হয়; নখ যাদের লুকিয়ে থাকে আর মোটা শরীর নিয়ে যারা গাছে চড়তে পারে না, প্রাণের ভয়ে সেই ছয়টা আহুরে বেড়াল, বিদ্যুতের হল্কার মতো শ্-শ্-শ্যাঁ—ৎ! করে গাঁয়ের মোড়লের ন্যাড়া চাঁচা-ছোলা তালগাছের একেবারে মগ্ ডালের গোছার ওপর উঠে বসল।

তারপর আর নামতে পারে না! এরা বারোজন মাঠা আর ছানা-মাখা ফস্কে যাবার ভয়ে, কত ডাকল, কত বোঝাল, কত ভয় দেখাল, কত ফুস্লাল। কিন্তু কিছুতেই-কিছু হল না।

শেষে যখন বলাই আর দামু কোমরে কাছি বেঁধে গাছে চড়বার তোড়জোড় করছে, তখন হল্লা শুনে উঠি-পড়ি করে, শুঁটকি মাছের হাঁড়ি হাতে, গয়লানী-মালি ছুটে এসে সুর করে বলতে লাগল,

'ও আবাগী! মচ্ছি-খাগী!
কি এনেছি তোদের লাগি!
শুঁটকি মাছ খাবি যদি নেমে আয়!
এ সুগন্ধে আকাশ-পথে সোনার রথে
সুয্যি-মামা থেমে যায়!
নেমে আয়! আ—তু—তু—তু—তু—'

আর বেশি বলতে হল না। মাছের খোসবাই নাকে যেতেই ছয় বিল্লি ভয় ভুলে সর-সর করে নেমে এসে, একসঙ্গে গয়লানী মাসির কোলে উঠবার জন্য হাঁকুপাকু করতে লাগল। মাসির একটু রাগও হয়েছিল। ইদিকে কাজ কম্মের নাম নেই, তা কিছু বলেছে কি না বলেছে, অমনি পিট্টান! ভোঁদা দেখল মাঠার আর ছানা মাখার তাহলে বোধ হয় হয়ে গেল!! সে মাসিকে বলল, 'রাগ কিসের মাসি? কাজ তো করে ওরা। ওরাই না ইঁদুর ভাগায়!—বলি মাঠা, ছানা পাব তো?'

মাসি একগাল হেসে বলল, 'পাবি, পাবি, সব ঠিক করে রেখে এসেছি। আয়, সোনামুখোরা, সবাই একসঙ্গে আমার কোলে আয়।'

তখন ছয়টা বেড়াল ছয় লাফে মাসির কোলে, মাথায়, ঘাড়ে চেপে—

পুরনো সেই মাছগন্ধী আরামপন্থী নিরাপত্তার আশায়, যা বলল সবাই খটমট দুর্বোধ্য এক বেড়ালীয় ভাষায়,—তার সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায়—

'মিয়াও— ম্যাও —মুম্ !

তোমার খাটের মধ্যিখানের যে জায়গাটা সবার থেকে নরম, তোমার গায়ের ছোঁয়াচ লেগে চ্যাপ্টা এবং গরম,—ভালোবাসার চোটে মোদের নেইকো লজ্জা সরম !—

মুম্ !
সেইখানেতে দেব মোরা নিরাপদে ঘুম্ !
বিদ্ঘুটে কুত্তো এলে বল দূর দূর !
তবু যদি না যায় তবে মারিও লগুড় !
আমরা ছ জনা তোমারি ক জনা,
অন্যায় যদি করে থাকি অ মা,
শুঁটকি মাছে ভাত মেখে, করিও ক্ষমা !
মুম্ !
দাও চুম্ !

বৃষ্টিতে কলকাতা

বিশ্বপ্রিয়

বৃষ্টি ঝরে···বৃষ্টি ঝরে
টাপুর টুপুর টুপুর—
জলে ভেজে বিবাদী-বাগ ;
ডালহৌসির দুপুর।
ট্রাম-ট্যাক্সী অচল-গতি
বৌ বাজারের মোড়ে,
গোমড়া মুখো বাস গুম্‌টি
ভাসে জলের তোড়ে।

তাই সপ সপ ভিজে ন্যাতা
কলেজ স্ট্রীটের পাড়া—
অথৈ পাথার ঠন্‌ঠনিয়ার
পথটা দিশেহারা !
আব্‌ছা আলোয় ঝাপসা কালো
শ্যামবাজারের মাথা,
বৃষ্টি মানেই ; বানে ভাসা
আধখানা কলকাতা ॥

॥ ২ ॥

টেনিদার খুব ইচ্ছে আমাদের পটলডাঙ্গায় নিয়ে যান। আমহার্স্ট স্ট্রীটের যে ছিরির বাড়িতে আমরা থাকি তা দেখে তাঁর মনে বেশ দুঃখ দুঃখ ভাবই হয়েছে নইলে আমাদের পটলডাঙ্গায় নিয়ে যাবার ব্যাপারে তিনি এত তৎপরই বা হবেন কেন?

কিন্তু ভাল কাজে অনেক বাধা। টেনিদা তো আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন আর আমাদের মাথার ওপর স্বয়ং ভগবান আমাদের ভাগ্যের চাবি কাঠিটি হাতে করে বসে আছেন। 'মাথার ওপর স্বয়ং ভগবান'—মানেটা বুঝলে না তো? আমাদের বাড়িওয়ালার নাম ডাঃ ভগবান দাস। তিনি আমাদের মাথার ওপর দোতলায় থাকেন। গোবিন্দ বলে উনি নাকি রুগী ধরা ডাক্তার। কত দিন ও দেখেছে উনি নাকি শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঠি দিয়ে কানে ব্যথাওয়ালা রুগীর কানের খোল পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, আর তার মধ্যে বেশ কজন প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে পাশের ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে পাশের ডাক্তারখানার ডাক্তারের সঙ্গে দশ আনা ছ আনার ভাগ। যেমন তোমরা চার্লি চাপলিনের বিখ্যাত ছায়াছবি কিড-এ দেখেছ। বাচ্চা ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে ঢিল মেরে জানালার কাঁচ ভাঙতে আর চার্লি স্বয়ং মিস্ত্রী সেজে মেরামত করছে, এ-ও ঠিক তাই। কিন্তু রুগী-ধরা ডাক্তার আমাদের যাবার পথে যত বাধাই সাধুক টেনিদার কানের খোল বের করবার যে সে সাহস পাবে না এ আমরা নিঃসন্দেহে জানতাম। সুতরাং আমরা শত বাধা বিপত্তি ত্যাগ করে মাথার ওপরের ঘরের ভগবান ডাক্তারের পৈ-পৈ করে বারন না মেনে টেনিদার সঙ্গে ওদের বাড়িটা দেখবার এবং যদি পছন্দ হয় সেখানেই চলে যাবার জন্য মনস্থির করলাম। এবং টেনিদা এলেই ওঁদের বাড়িটা ওঁর সঙ্গে দেখতে যাব বলে স্থির করলাম। ভগবান ডাক্তার আমাদের অনেক ভয় দেখালেন। 'দেখবেন মশায়, শেষে কিন্তু চলে গিয়ে পস্তাবেন না। আমার বাড়ির ভাড়াটে অনেক পাব কিন্তু একবার চলে গিয়ে যদি আবার আসতে চান তাহলে কিন্তু বাড়ি আর আমি

দিতে পারবো না। তা আমি আগেই বলে রাখছি।' 'সে তখন দেখা যাবে', উনি অনাসক্ত গলায় বললেন 'তা একটা কথা বলে রাখি মশায়—যাবার সময় একটা নৌকো সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—যা জল দাঁড়ায়'—বলেই দরজার কাছে তাকিয়েই ভগবান ডাক্তার বোবা হয়ে গেলেন। দরজায় স্বয়ং টেনিদা দাঁড়িয়ে।—কটকট করে ভগবান ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দু'জনের চোখাচোখি এবং সাদর সম্ভাষণ হলো এই রকম, 'এই যে ডাক্তারবাবু, আপনিই না শেয়ালদার একটা ডাক্তারখানায় আমাদের কুলপুরোহিত চণ্ডীঠাকুর মশায়কে দাঁত তুলে দাঁত বাঁধিয়ে দেবেন বলে কার এক পাটি ফালতু দাঁত মুখে লাগিয়ে দিয়েছেন?'

ডাক্তারবাবু খাবি খেতে লাগলেন, যেন অগাধ জলের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন নারানদা, কাল আমাদের বাড়ির ষষ্ঠীপুজোর প্রসাদ খেতে গিয়ে চিঁড়ের মোয়াতে কামড় দিতেই বাঁধান দাঁতের পাটি মাটিতে খসে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে কাকে নিয়ে উধাও। দাঁড়ান—এবার আপনার একপাটি দাঁত যদি না খসিয়ে নিয়েছি তবে আমি টেনিরামই নয়।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ডাক্তার তর তর করে একতলা থেকে মই বেয়ে দোতলায় উঠে মইটা টেনে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে টেনিদার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন অবজারভেসন টাওয়ারে বসে নিশ্চিন্তে। 'দেখলেন নারানদা, দেখলেন! লোকটা এমন ছুঁচো যে পয়সা খরচ হবে বলে দোতলার সিঁড়ি বানায় না। মই দিয়ে ওঠা নামা করে তাছাড়া ওঁর আর একটা সুবিধে আছে। দিন-রাতই রুগী ধরে তাদের সর্বনাশ করছে। কেউ বাড়িতে এসে দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে ওঁকে ধরে তার সাধ্য কি রেখেছে?'

'আরে ছাড়ান দেন। পোলাপান।' 'আমি ওকে জলপান করে ছাড়বো।' টেনিদা নাক দিয়ে এক ঘোঁৎ করে শব্দ করলেন। আমি সুযোগ বুঝে বললাম, 'টেনিদা, দেখছেন তো যেমন বাড়িওয়ালা তেমনি বাড়ি। আজ এখুনি আপনাদের বাড়িটা দেখতে গেলে হয় না? যদি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আর দেরী না করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের বাড়ি চলে যাব।' 'বেশ চলুন।'—টেনিদা রাজি হয়ে গেলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে পটলডাঙ্গা কতটুকুই বা পথ। আমরা সদল-বলে হেঁটেই চললাম। দলের লীডার টেনিদা সবার আগে রয়েছেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটের ডাঃ কার্ত্তিক বোস মশায়ের ল্যাবরেটরির পেছনে আমাদের বাড়ি ছিল। আমরা টেনিদার সঙ্গে বেরিয়ে সেন্টপলস্ কলেজের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম টেনিদা গান ধরলো, 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রোজ পানতুয়া শত শত।' ব্যাপরে কী গলা। যেন গ্রামাফোনের চোঙ্গায় মুখ দিয়ে চেঁচাচ্ছে—। সামনের গাছে বসে চুরির আশায় কয়েকটা প্রতীক্ষাতুর কাক ছুটে পালালো। আর ঠিক এই সময়ে আমরা আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিস পার হয়ে সেই শিব মন্দিরের উল্টো রাস্তাটার ওপর দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ দম ফুরিয়ে যাওয়া গ্রামাফোনের মত টেনিদার গান বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা তো হতবাক!

সামনের ফুটপাতে দুদিকে পা ছড়িয়ে কম্পাসের মত সরু সরু ঠ্যাংওয়ালা একটা লোক টেপ

রেকর্ডারে টেপকরা গলায় একটানা চেঁচিয়ে চলেছে অনর্গল। সামনে একটা উড়েদের তেলে ভাজার দোকান সেখানে কোমরের পেটি-ফেটি খুলে একটি মোটা সোটা ভালমানুষ পুলিশ ইট পেতে হাতে শাল পাতা করে তেলেভাজা খাচ্ছে আর লোকটার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

লোকটা গঙ্গাফড়িং এর মত হাত ফাত ছুঁড়ে বলে চলেছে—'এই ধরুন, সকালে উঠলুম, চা খেলুম। —না-না চা খেলুম না, বাজারে গেলুম।—না-না বাজারে গেলুম না মুড়ি খেলুম—।' লোকটার কথা আর এগোয় না।

এই বক্তব্যের উপস্থাপন সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন—হয়েই চলেছে। চোখ গোল গোল হয়ে চাকার মত চক্রাকারে ঘুরছে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠে যাচ্ছে।—তবু ক্ষান্ত হচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিষয়বস্তু বদলাচ্ছে বৈকি। যেমন ধরুন—'এই যে, পুলিশদাদা আপনি তেলেভাজা ভালবাসেন'—, বলতেই পুলিশদাদার হাতটা কেঁপে তেলেভাজাটা যেই মাটিতে পড়া আর সামনের গাছে একটা ডাকাত কাক কালবিলম্ব না করে একেবারে ছোঁ মেরে সেটা নিয়ে ছুট দিল। —'আমি ভালবাসি না'—পুলিশ দাদা মর্মাহত।

'এই যে টেনিচন্দরদা'—বলার সঙ্গে সঙ্গে টেনিদা একটা আড়াইমনী রদ্দা ওর নাকে বসিয়ে দেবার আগেই মনে হলো লোকটার নাসিকের টিকিট কাটাই ছিল। সুতরাং কুরুবকের মত বক-বক বন্ধ করে একেবারে দে ছুট—দে ছুট—। আমরা লিডার টেনিদাকে বগলদাবা করে বিজয়ীর মত মণ্ডলের লণ্ড্রীর পাশ দিয়ে পটলডাঙ্গার গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু দুলেদের বাড়ির সামনে এসেই আমাদের ব্যাক করতে হলো। কারটুন ছবিতে যেমন দেখা যায় সারি সারি ছোট ছোট হাতির দল শুঁড় দিয়ে এ ওর ল্যাজ চেপে ধরে এগিয়ে চলেছে—পটলডাঙ্গার গলির মধ্যে আমরাও এ-ওর পেছনে গুটি গুটি চলেছি কিন্তু গোবর্ধনবাবুর বিপুল শরীর ভুঁড়ি শুদ্ধ আটকে গেছে। গোবর্ধনবাবু টেনিদাদের প্রতিবেশী। বজ্রকণ্ঠে টেনিদার হুঙ্কার শোনা গেল: 'জ্যাটাইমা দরজা খুলুন—তা নইলে "জ্যাটামশায়ের" জন্যে দমকল ডাকতে হবে। কেন যে ওঁকে বাইরে

পাঠান জানিনা।' সঙ্গে সঙ্গে "খুলিল পশ্চিমদ্বার অশনি নিনাদে"-র মত দুম করে দরজাটা খুলে গেল আর খ্যাংরা কাঠির মত হাত দিয়ে আলুর বস্তার মত ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে জ্যেঠিমা তাকে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো দুড়ুম করে।

টেনিদা বললে, 'চিচিং বন্। মানে, নারানদা এমনি প্রায়ই হয়। আমরা কত বলি আপনি ঘর থেকে বেরুবেন না। যা করেন জ্যেঠিমাই করবেন কিন্তু তিনি কী শুনবেন কোন ভাল কথা। সে বান্দাই নয় গোবর্ধন জ্যাঠামশায়। গলিতে বেরুবেন আর আটকে যাবেন। টেনিদাদের বাড়ির উল্টো দিকেই তাঁর বাড়ি এবং পরে দেখেছি মাথার সমস্ত নাটবলটুই তাঁর একদম ঢিলে। তাঁর কথা পরে হবে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা টেনিদাদের বাসায় পৌঁছে গেছি।

'এই আমাদের বাড়ি', টেনিদা বললেন। গলিটা সংকীর্ণ বলেই প্রায়ান্ধকার। কাঁচা রাস্তা। প্রাইভেট প্যাসেজ আর পরস্পর বাড়িতে আপোষের অভাব বলেই রাস্তাটা করপোরেসন পাকা করেনি চারিদিক ইঁদুর আর ছুঁচোর অবাধ গতিবিধি এবং গর্ত। আমরা তো একটা ধেড়ে ছুঁচোকে একেবারে ওভারবাউণ্ডারী করে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম।

বাড়িটা বেশ লম্বা রেলগাড়ীর মত। লাল রঙের দরজার কাছে মাথার ওপর মাদাগাস্কার মরিসাসের ম্যাপের ছবি আঁকা গোটা চারেক আরশোলাকে বিস্মিত হতচকিত করে আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকতেই চারদিকে এক আনা, দু আনা, আট আনার মত সারি সারি শিশুপাল উচ্চিংড়ের মত ছটকে এদিক ওদিক দৌড়োতে লাগলো। টেনিটা ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মত হুঙ্কার দিলেন, 'নদে, বোদে—ঠিগ্‌রে সব ওপরে যাও!'

ওরা এ বাড়ির প্রাক্তন বাড়িওয়ালার ছেলেরা ওরা বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে বটে কিন্তু বাড়ি ছাড়েনি। মাস ছয়েক ভাড়াটে হিসেবে থাকার অনুমতি পেয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। ইতিমধ্যে ওদেরই একটি বিবাহিত মেয়ে ঘুন্টি আধ হাত ঘোমটা টেনে কুমড়োপটাশের মত হট্টমূলার গাছের সন্ধানে ছুটে পালালো যেন কোনদিকে। বোধহয় আমাদের দেখে লজ্জা পেল।

'যত সব! আপনি কিছু মনে করবেন না দাদা। এরা এত বিরক্ত করে আমাদের সব সময় যে কী বলবো। যদি কেউ বাড়িতে এলো তাহলেই হয়েছে। যেন এরা চাঁদের অধিবাসী প্রথম মানুষ দেখলো এইভাবে মানুষকে অবাক হয়ে দেখতে থাকবে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা।'

উনি বললেন, 'ছাড়ান দিন্—ছাড়ান দিন।—আমাদের ঘরটর কোনগুলো তাই দেখান। বাড়ি তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে—তোমার?'

আমি বললাম, 'খুব! গ্র্যাণ্ড বাড়ি—আমার এ বাড়ি একেবারে যাকে বলে মনের মত ঠিক তাই।'

টেনিদা ভারি খুশি হলেন।

'কিন্তু উঠোনে একটা যে গরু বাঁধা আছে লোহার মোটা শেকলে ওটা সাপের মত অমন ফোঁস ফোঁস করছে কেন?' সভয়ে শুধোলাম।

টেনিদা বললে, 'কী আর বলবো। গরুটা তো গরু নয়, সাক্ষাৎ যম। যদি ওই শেকল কোন

মতে ছিঁড়তে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই। আমাদের সকলের প্রাণ যাবে। ও দারুণ মারকুট্টে। তাই ওকে অত মোটা লোহার শেকলে ওরা বেঁধে রেখেছে।'

'তবে যে বললেন, বাড়ি ওরা বিক্রি করে দিয়েছে। বাড়ির জিনিসপত্র সব?'—উনি জানতে চাইলেন।

'সব বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। শুধু ওই গরুটা বিক্রি হয়নি। কি করে বিক্রি হবে? যে গরু কিনতে আসে তাকেই গরুটা এমন তাড়া করে চটে গিয়ে যে একেবারে গাইবাঁধাতে গিয়ে তবে তার নিশ্চিন্দি। গরুটা নিয়ে ওরা বড্ড ঝামেলায় পড়েছে।' টেনিদাও যেন বেশ চিন্তিত হলেন।

'তাহলে গরুটা—'

'হ্যাঁ, ওটার ভাগ নিয়েই যত ঝামেলা—'

'তাহলে কেটে ভাগ করা ছাড়া আর কোন তো উপায় দেখি না।'

'তা বটে। তবে আপনার এই একখানা আর ওই একখানা দুখানা ঘর। সামনের বিরাট বারান্দা। এগুলো থেকে গরু তো অনেক দূরে থাকবে নিশ্চয়।'

'কিন্তু দরজার কাছেটাছে তো আপনারা বাঁধবেন না গরুটাকে? তাহলেই গেছি আর কি।'

'আরে না—না।'

'তাহলে বাড়ি পছন্দ হয়েছে তো আপনাদের'?

'খুব—খুব।'—আমি বললাম। 'যেখানে ছিলাম, দেখেন তো। তার চেয়ে এ বাড়ি তো অনেক ভাল।'

'তবে আমরা কবে আসবো বলুন?'

'সামনের সপ্তাহে।'—টেনিদা খুশি হয়ে বললে। [আগামী বারে শেষ

শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চিংড়ি বগার কথা

কমল শোভিত এক শান্ত সরোবরে
শ্রীমতী চিংড়ি বসে পদ্মপাতা 'পরে
একমনে ভক্তিভরে জপে হরিনাম—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম।
পুকুরের পাড়ে বসে ছিল এক বক,
চিংড়ি দেখে চক্ষু তার করে চকচক,
রণপার মতো তার পায়ে নাচি নাচি
চিংড়ির দিকে আরো এল কাছাকাছি।
ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ব'লে ঢ্যাঙা বক—
'ওলো কুচো চিংড়ি তোর থামা বক বক।
এবারে যে তোরে আমি পেমু খপ্পরে,
আয় দেখি জলযোগ সারি টপ করে;'
'চিংড়ি বগার কথা' অমৃত সমান।
বলে যাই শুন সবে খাড়া করি কান॥
বকের এ কথা শুনে চিংড়ি ওঠে জ্বলে।
চোখ দুটো ঘুরিয়ে সে ঝামটা দিয়ে বলে—
'ও ঢ্যাঙা-প্যাঁকাটি-ঠ্যাঙা সারসের বেটা,
ভদ্রতা কাকে বলে শেখনি কি সেটা?
পাখাটাই সাদা তোর; মন তোর কেলো।
লো বললি মোরে তুই! এত আমি খেলো।
খুব যে দেখিস তুই ধরাটাকে সরা।
কত ধানে কত চাল ছাখ এবারে ত্বরা।'
এই বলে বকটাকে বকে নিয়ে খুব
চিংড়ি তিড়িং করে জলে দিল ডুব।
ঘাটের পাড়েতে ছিল কাঁকড়ার বাড়ি—
শ্রীমতী চিংড়ি সেথা এল তাড়াতাড়ি।
'চিংড়ি-বগার কথা' অমৃত সমান।
বলে যাই—সকলে শুন ভরি প্রাণ॥

চিংড়িকে দেখে বলে শ্রীমান কাঁকড়া
'ঝগড়া করেছিস বুঝি ? নতুন ফ্যাঁকড়া ?
পুজোআচ্চা নিয়ে তুই থাক সারাক্ষণ—
পরের হাঁড়িতে তবু কেন দিস মন ?'
এই শুনে চিংড়ি বলে ছলোছলো চোখে,
'না শুনেই সব কথা কেন যাস বকে ?
তুই যদি সত্যি মোর দাদাভাই হ'স
রাখতে বোনের মান দেখা না সাহস !'
সব কথা কাঁকড়াকে বলিল শ্রীমতী,
'লো বললো আমাকে সে ! এখনই দুর্মতি !'
কাকড়ামশাই তার গোঁফে দিল চাড়া.
চোখ দুটি লাল হল, ফুলে ওঠে দাঁড়া,
'চিংড়ি বগার কথা' অমৃত সমান।
কি করে রাখিল ভ্রাতা ভগিনীর মান ॥
দুইজনে যুক্তি করে এক ফের ফিরে,
দেখে—বগা চুপ করে বসে আছে তীরে।
শ্রীমতী বসল ফের পাতাটাতে গিয়ে
আড়ালে কাঁকড়া রয় দাঁড়াটা বাগিয়ে।
চিংড়িকে দেখে বক এল সেথা উড়ে,
গলাটা ঝুঁকিয়ে বলে ঠাট্টার সুরে—
'ওলো কুচোচিংড়ি, তুই ভারী একফোঁটা !
মোর চোখে ধুলি দিয়ে পালাবিটা কোথা ?
গিললাম এইবারে'—বলে যেই বক
নামাল গলাটা তার—ঘুচে গেল সখ।
কাঁকড়া বসে দাঁড়া দুটো দিতেছিল শান—
বকের গলাটা চেপে, করিল দুখান।
'চিংড়ি বগার কথা' সমাপ্ত হল।
সবে মিলে হাত তুলে হরি হরি বল।

দুঃস্বপ্ন ৩ উইনস্টর ম্যাককে

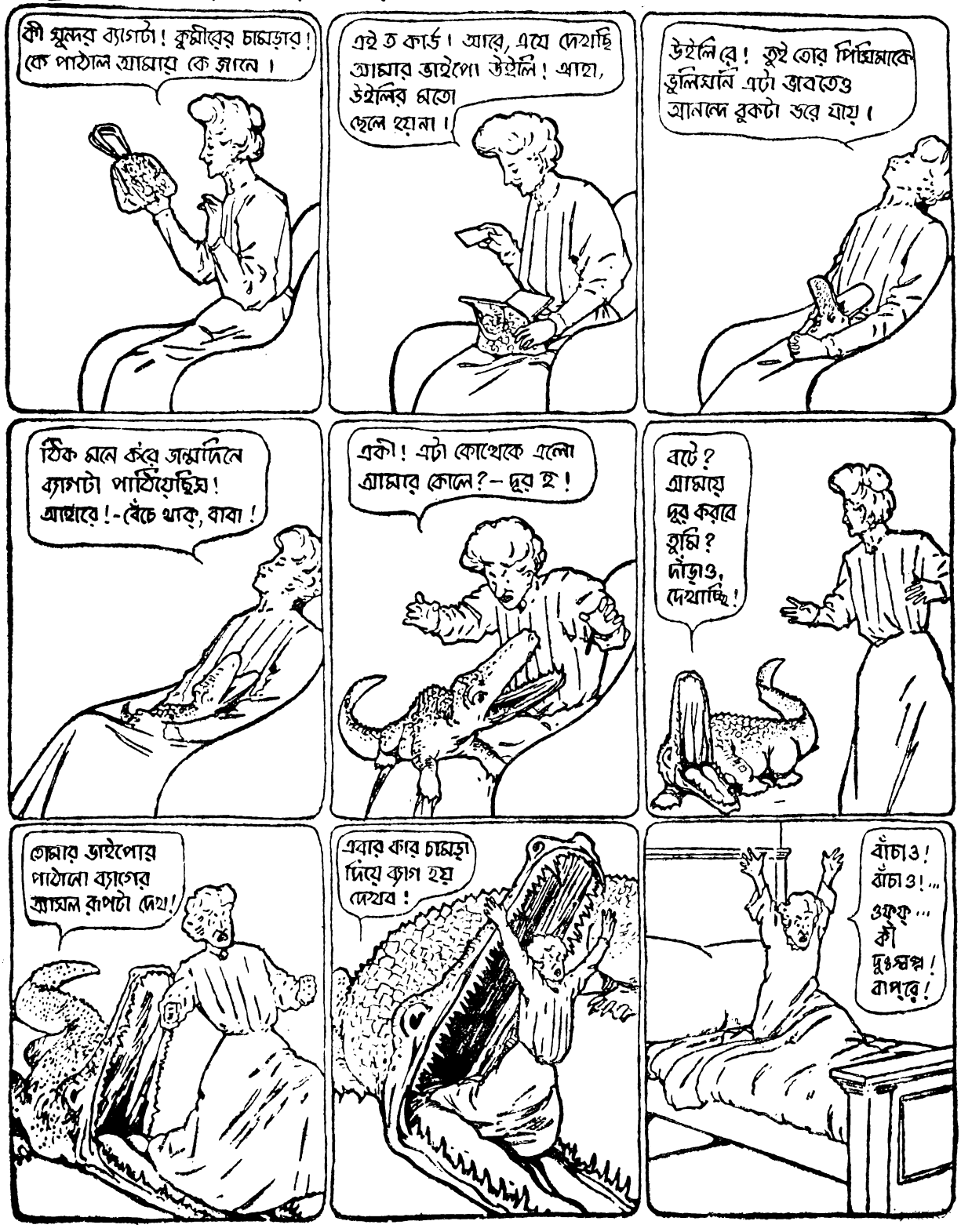

। ৩ ।

প্রথম দিন সকালে দ্বারভাঙ্গা ঘাটের শুটিং-এ বিশেষ ভিড় না হলেও, বিকেলে সেই একই ঘাটে গিয়ে দেখি তার চেহারাটা হয়েছে ফুটবল স্টেডিয়ামের মতো। শুধু ঘাটে কেন, গঙ্গার বুকেও হঠাৎ নৌকোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যারা ডাঙায় জায়গা পায়নি তারা জল থেকে শুটিং দেখার মতলব করেছে। নৌকোয় আপত্তি নেই, কারণ বেনারসে ছুটিতে এসে বহুলোকেই বিকেলে নৌকো ভাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু ঘাটের দর্শকদের সামলাতে হবে। এই ভিড় জিনিসটা যে কী মারাত্মক হতে পারে সেটার একটা উদাহরণ একটা পুরোন ছবি থেকে দিই।

চিড়িয়াখানা ছবির আউটডোর শুটিং হয়েছিল কলকাতার বাইরে বারাসত ছাড়িয়ে বামুনগাছি বলে একটা গ্রামে। আমবাগানের মধ্যে একটা বেশ বড় খোলা জায়গায় আমরা পাঁচিলে ঘেরা গোলাপ কলোনির সেট তৈরি করে নিয়েছিলাম। কোনো ফিল্মের জন্য বিশেষ করে তৈরি করা ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটকে বলে সেট। গল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ সাহেবের তৈরি এই কলোনিতে ছিল ফুলের বাগান (যাকে বলে নার্সারি), পুকুর, কলোনির কর্মচারীদের থাকবার জন্য গোটা ছ'য়েক কটেজ, জজ সাহেবের নিজের বাংলো, একটা বড় গোয়ালে আট দশটা গরু, আর বেড়া দিয়ে ঘেরা পোল্ট্রি। অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে প্রায় একমাস ধরে অনেক খেটে অনেক খরচে আমরা তৈরি করেছিলাম এই কলোনি। শুটিং-ও হবে প্রায় একমাস।

শুটিং-এর জায়গা থেকে মাইল দু-এক দূরে রেলের স্টেশনে ট্রেন আসা-যাওয়ার শব্দ পেতাম। এটা জানতাম যে দুপুরে একটা সময় কলকাতার একটা ট্রেন এসে সেখানে থামে।

প্রথম কয়েকদিন নির্বিবাদে কাজ হল। তারপর একদিন কলকাতার ট্রেনটা ছেড়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে একটা কোলাহল শুনতে পেলাম। ক্রমে কোলাহল স্পষ্ট হবার পর বুঝতে পারলাম ছেলের দল আসছে স্লোগান দিতে দিতে। স্লোগান হল, 'শুটিং দেখতে দিতে হবে! ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' আরো কাছে এলে পর পাঁচিলের উপর দিয়ে সড়কির ডগা দেখা গেল। পরে বেরোল সেগুলো সড়কি নয়, ছেলের দল আখের খেত থেকে খান পঞ্চাশেক আখ উপড়ে নিয়ে সেগুলো কাঁধে নিয়ে আসছে। তারা এসেই পাঁচিলের বাইরে যত আমগাছ ছিল সব কটার যুৎসই ডালগুলো দখল করে ফেলল। অবাক হয়ে দেখলাম যে ছেলের ভিড়ে গাছের পাতা আর দেখাই যাচ্ছে না। আমরা এই অবস্থাতেই কাজ সুরু করে দিলাম, কারণ একবার তাদের নামতে বলার পরক্ষণেই কলোনি জুড়ে ইষ্টকবর্ষণ সুরু হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক কাজের

পর হঠাৎ একটা মড় মড় শব্দ শোনা গেল, এবং তার পরেই ঝুপঝাপ্, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ।

একটা গাছের ডাল ভেঙে সাতটি ছেলে মাটিতে পড়েছে, তার মধ্যে একজন গুরুতর ভাবে জখম। সেই জখম ছেলেকে ফার্স্ট এড দিল আমাদেরই একজন অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শুভেন্দু এককালে ডাক্তারীর ছাত্র ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে এমন একটা দুর্যোগের পরেও দলের কারুরই শুটিং দেখার উৎসাহ কমল না, এবং একটি ছেলেও গাছ থেকে নামল না। এই ভাবে এই অবস্থায় পর পর চারদিন আমাদের শুটিং করতে হয়েছিল। এমনও দেখেছি যে মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাদের কাঁধে চড়িয়ে গাছে তুলে দিচ্ছে এই সব ছেলেরা। মহিলারাও এই সুবর্ণসুযোগ পেয়ে পরম আহ্লাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের ডালে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, সিনেমাটা যে পর্দায় দেখার জিনিস সেটা অনেকেই ভুলে যায়। তারা ভাবে খোলা মাঠে যেমন লোকে যাত্রা দেখে, খোলা রাস্তাঘাটে শুটিং দেখাটাও বুঝি সেই রকম জিনিস।

যাই হোক্, ঘাটে ভিড় হবে সেটা আন্দাজ করেছিলাম, তাই সঙ্গে মোটা দড়ি আনা হয়েছিল। সেটা বার করে ভানু আর কামু কর্ডন তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এসব অবস্থায় মেজাজ গরম করে কোনো লাভ হয় না; সবাইকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দিতে হয় ভিড় করে এগিয়ে এলে আমাদের কাজের কী ধরণের ক্ষতি হয়। যখন বলা হল যে কাজের জায়গাটুকু খালি করে না দিলে আমরা কাজ বন্ধ করে ক্যামেরা গুটিয়ে সরে পড়ব, আর তাহলে কারুরই কিছু দেখার থাকবে না, তখন সকলেই মোটামুটি ভদ্র হয়ে দড়ির পিছনে রয়ে গেল।

এদিকে উৎপল দত্ত উত্তরে দুটো ঘাট দূরে বজরার মাথায় আরামকেদারায় রেডি হয়ে বসে আছে, আমাদের একজন লোক সে ঘাটে রাখা হয়েছে, আমরা তৈরি হলে তাকে সিগন্যাল করব, তখন তার ইসারায় মগনলালের বজরা আমাদের ঘাটের দিকে রওনা হবে। ঘারভাঙ্গা ঘাটে ফেলুদা, লালমোহন আর তোপ্‌সে রেডি হয়ে আছে, আর তাদের সঙ্গে আছেন লিট্‌ল থিয়েটারের সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ক্যালকাটা লজের ম্যানেজার চক্রবর্তী মশাইয়ের পার্ট করছেন। মগনলালের বজরা দেখতে পেয়ে এই চক্রবর্তী মশাই কাশীর এই ডাকসাইটে লোকটিকে ফেলুদের চিনিয়ে দেবেন। ফেলু বাইনোকুলার দিয়ে মগনলালকে দেখবে, তারপর বজরা আমাদের ঘাটে লাগলে পর মগনলাল হাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভৃত্যের হাত থেকে রূপোর বেকাবির উপর সিল্কের রুমাল দিয়ে ঢাকা উপঢৌকন নিজের হাতে নিয়ে ফেলুদের সামনে দিয়েই মছলিবাবার সভার দিকে চলে যাবে। মগনলাল হল মছলিবাবার মস্ত ওয়ান ভক্ত।

যদিও মছলিবাবা ঘাটেরই একটা অংশে বসেন, এ দৃশ্য কাশীতে না তুলে কলকাতায় তোলা হবে, কারণ সভায় অনেক ঘটনা আছে যেটা স্টুডিওতে তোলা অনেক বেশি সুবিধা। এবারে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে, তোলা হল মগনলাল ফেলুদার সামনে দিয়ে মছলিবাবার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর এপ্রিল মাসে কলকাতায় তোলা হবে মগনলাল মছলিবাবার সামনে বসে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাতে উপঢৌকন তুলে দিলেন। দর্শক যখন ছবি দেখবে, তখন এই দুমাসের ব্যবধানটা তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

প্রথম দিন মগনলালের যে দৃশ্যটা তোলা হল সেটা ছবির একেবারে গোড়ার দিকের দৃশ্য; আর দ্বিতীয় দিন তোলা হল ছবির একেবারে শেষ দিনের দৃশ্য। এখানেও মগনলাল বজরা করে এসে হাতে ভেট নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কিন্তু এবার তাকে দেখছে কেবল লালমোহন আর তোপ্‌সে। এই লালমোহন আর তোপ্‌সেকে দেখে চেনা মুশকিল হবে, কারণ তারা ফেলুর নির্দেশমতো দুজনেই ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে। দুজনেরই পরণে গেরুয়া, মাথায় জটা, কপালে চন্দন আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লালমোহনের হাতে আবার যষ্টি আর কমণ্ডলু। তাকে বুরুজের উপর বসে

মাঝে মাঝে গালবাদ্য আর ঝম্ ঝম্ করতে হচ্ছে, তোপ্‌সে খেয়াল রাখছে জটায়ু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে কিনা। মেক-আপ যে দুর্ধর্ষ রকম ভালো হয়েছিল সেটা বুঝলাম যখন দেখলাম লালমোহন ঘাটে হাজির হওয়ামাত্র একটি পাণ্ডা তাকে মহাভক্তিভরে প্রণাম করল। লালমোহনও দেখি দিব্যি আধবোঁজা চোখে তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

ভিড় সত্ত্বেও ঘাটের শুটিং আশ্চর্যভাবে উৎরে গেল। কাজের শেষে আমরা আর ভিড়ের দিকে না গিয়ে সবাই মিলে বজরার ছাতে চড়ে বসলাম। বজরাই আমাদের দশাশ্বমেধ পৌঁছে দিল। যেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি ঘাটে কাজ হত সেদিন দুপুরের খাওয়াটা বজরাতে বসেই সারা হত। কাগজের বাক্সে শুকনো খাবার, শেষ হলেই বাক্স জানালা দিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আর অমনি চিলের দল ছোঁ মেরে বাক্স থেকে চপ-কাটলেটের টুকরো তুলে নিচ্ছে।

* * *

দ্বারভাঙ্গার কাজ শেষ করে আমাদের যেতে হয়েছিল দক্ষিণে বেশ খানিকটা দূরে বিখ্যাত কেদার ঘাটে। কাউকে বলা হয়নি যে আমরা ঘাট বদল করছি, তাই বিকেল হতে না হতে সব লোক গিয়ে হাজির হয়েছিল সেই দ্বারভাঙ্গা ঘাটেই। কিন্তু কেদার ঘাটে শুটিং-এর তোড়জোড় করার সময় দেখা গেল উত্তর দিক থেকে পিল পিল করে লোক আসছে হেঁটে আর নৌকায় এই কেদারের দিকেই। আসল খবর কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে শুটিং দর্শনপ্রার্থীদের কানে সেটা দেখে বেশ অবাক লাগল। ভিড় যদি বা দূরে সরে গিয়ে আমাদের শট্ নিতে দেয়, তাহলেও একটা অসুবিধায় পড়তে হয় তখনই যদি দৃশ্যটা হয় মজার, আর সেই মজায় যদি লালমোহনের একটা বড় ভূমিকা থাকে। শটের মধ্যে দর্শক হো হো করে হাসতে আরম্ভ করে, ফলে অভিনেতারা যে কী কথা বলছে, আর সেটা ঠিক ভাবে বলছে কিনা সেটা বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। টেপ রেকর্ডারে অবিশ্যি সাউণ্ড তোলা হচ্ছে, কিন্তু তাতেও দর্শকদের হাসির শব্দ অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে। এই হাসির ভেতর ফেলু তোপ্‌সে লালমোহনের কথা খুঁজে বার করা অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ একাজটা না করলেও নয়, কারণ কলকাতায় এসে এই টেপ শুনেই এদের তিনজনকে দিয়ে আবার কথাগুলো বলিয়ে নতুন করে রেকর্ড করে ছবির সঙ্গে জুড়তে হয়ে। একেই বলে 'ডাবিং'। এই ডাবিং নিখুঁৎ হলে পরে ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে কথা হুবহু মিলে যায়, আর লোকে ধরতেই পারে না যে ছবি আগে তোলা হয়েছে, শব্দ পরে জোড়া হয়েছে।

ঘাটের পরে গলি নিয়ে পড়তে হল। ফেলুদারা এসে উঠেছে দশাশ্বমেধ রোডের উপর ক্যালকাটা লজ হোটেলে। সেখান থেকে বিশ্বনাথের গলি ধরে জ্ঞানবাপী পেরিয়ে আরো কয়েকটা অলিগলি পেরিয়ে তাদের যেতে হবে মগনলালের বাড়ি। এই যাওয়ার পথে কথাবার্তা আছে, আর আছে ষাঁড়ের সামনে পড়ে লালমোহনের ভড়কানো। বিশ্বনাথের গলিতে ভিড় ম্যানেজ করে শট্ নিয়ে জ্ঞানবাপীতে মগনলালের সঙ্গে মিটিং-এর শট্ নিয়ে যে গলিতে ষাঁড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে সেখানে ক্যামেরা সমেত গিয়ে হাজির হলাম। কলকাতায় বসে যখন চিত্রনাট্য লিখেছি তখন জানতাম না যে কাশীতে গত কয়েক বছরে ষাঁড়ের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। অথচ ষাঁড় ছাড়া কাশী ভাবাই যায় না, আর ষাঁড়ের সামনে পড়ে জটায়ুর কী দশা হবে সেটাও দেখান দরকার। গলির লোকেরা বলল কাছাকাছির মধ্যে কোনো ষাঁড় নেই, ষাঁড় আনতে হবে ঘাট থেকে। তার মানে কম করে মাইল খানেকের পথ। আর ষাঁড়-বাবাজী সেখানে থাকলেও, তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে আমাদের বাছাই করা এই গলিতে আসবেন কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন।

কামু এগিয়ে এল। বলল হাতে ষাঁড়ের খাদ্য কিছু শাকসবজী নিয়ে ষাঁড়কে প্রলোভন দেখিয়ে সে যে করে হোক্ তাকে শুটিং-এর জায়গায় এনে হাজির

বেনারসের ঠঠেরি বাজারের বিখ্যাত মিঠাইয়ের দোকান শ্রীরামভাণ্ডারের সামনে শুটিং।

তোপ্‌সেবাবাজী আর লালমোহনবাবাজীকে পরিচালক নির্দেশ দিচ্ছেন।

এই ভীড় সরিয়ে তবে ষাঁড়ের শুটিং করতে হয়েছে।

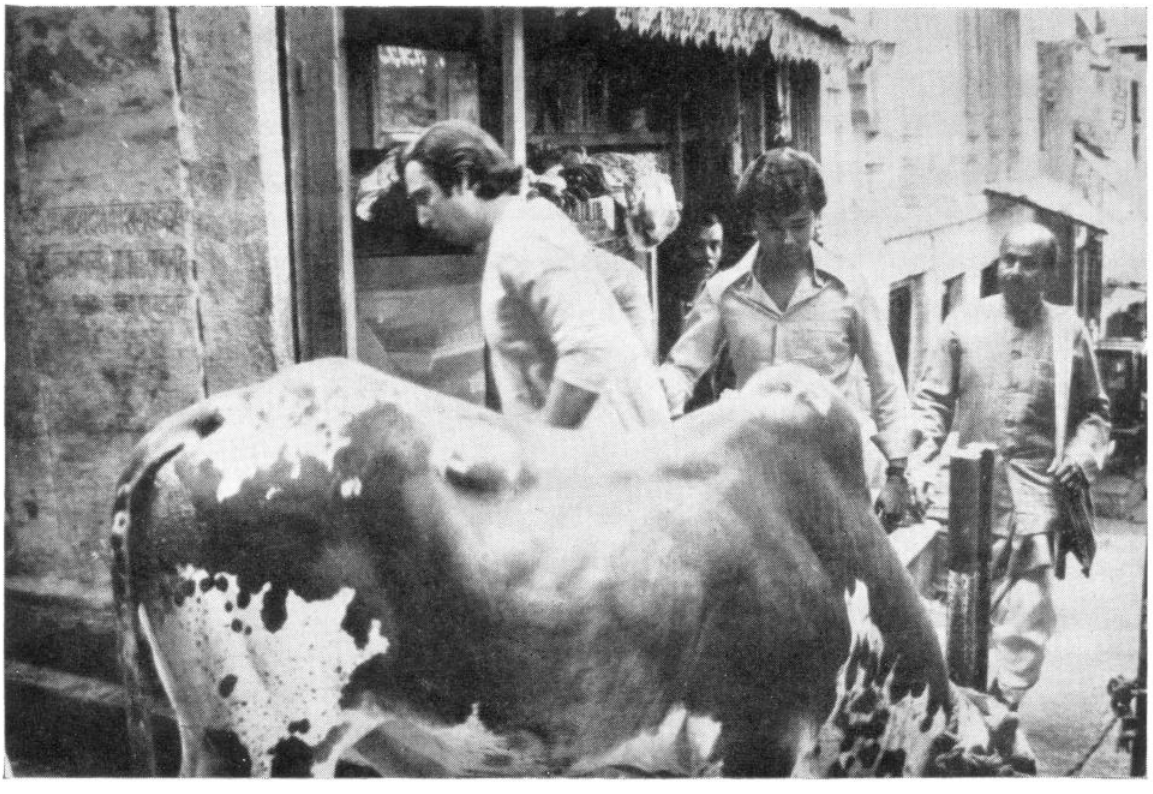

ফেলুদা আর তোপ্‌সে ষাঁড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে লালমোহনের ইতস্ততভাব।

করবে। কামু আমাদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে চলে গেল, আমরা অপেক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। খুব ভোরে বেরোন হয়েছে, প্রাতরাশের সময় পাওয়া যায়নি, তাই কাছেই বিশাল আকারের জিলিপি ভাজা হচ্ছে দেখে তাই দিয়ে সকলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

লালমোহন দেখলাম মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন; সেটা বোধহয় ষাঁড়ের চিন্তাতেই। সোনার কেল্লায় তাকে উটের সামনে পড়তে হয়েছিল; সেখানেও চিন্তার কারণ ছিল। তবে ষাঁড়ের তুলনায় উট অনেক বেশি নিরীহ। ষাঁড়মশাই কখন কী করে বসেন সেটা আগে থেকে অনেক সময়ই বোঝা যায় না। তাই লালমোহনের উদ্বেগের কারণ আছে বৈকি। এখানে আরেকটা দৃশ্য নিয়ে একজন অভিনেতার উদ্বেগের গল্প একটু বলে রাখি। সোনার কেল্লায় ভিলেন মন্দার বোস ডাক্তার হাজরাকে ঠেলা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। শৈলেন মুখার্জি করেছিল ডাক্তার হাজরার পার্ট। তাকে যে মন্দার বোস ঠেলা মারবে সেটা শৈলেন জানত, কিন্তু দৃশ্যটা ঠিক কী ভাবে তোলা হবে সেটা আমার জানা থাকলেও আমি ওকে বলিনি। ও বোধহয় ভেবে রেখেছিল যে সত্যজিৎ রায় যখন ফাঁকি দেওয়া পছন্দ করেন না তখন ওকে বুঝি সত্যিই পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে। রাজস্থান যাবার আগে শৈলেন তার বাড়িতে বলে গেল—'যাচ্ছিত, কিন্তু হাড়গোড় কিছু রেখে আসতে হতে পারে এটা বলে গেলাম।' তারপর একেবারে জয়পুর পৌঁছে শট নেবার ঠিক আগে শৈলেনকে বলা হল যে তাকে মন্দার বোস ঠেলা মারবে ঠিকই, কিন্তু সে পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ার আগে ভানু তাকে ধরে নেবে, আর তারপর তাকে দেখানো হবে একবারে পাহাড়ের নিচে জখম অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং তার চিন্তার কোনো কারণ নেই। শট্ নেবার পর সেইদিনই শৈলেন কলকাতায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিল—'তোমাদের কোনো চিন্তা নেই, আমার হাড়গোড় সব ঠিকই আছে।'

এদিকে ষাঁড়ের গলিতে ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে। ঘাটে ছিল বাঙালীদের ভিড়, আর এখানে শুনছি খালি হিন্দি কথা। শুটিং দেখার উৎসাহে এখানেও কেউ কম যায় না। মনে মনে ভাবছি ষাঁড় গলির কাছাকাছি পৌঁছলেও এই ভিড় ভেদ করে আমাদের ক্যামেরার সামনে পৌঁছবে কি?

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কামুর আবির্ভাব হল। কিন্তু ষাঁড় কই? কামু মুখ কালো করে বলল ষাঁড় অর্ধেক পথ খাদ্যের লোভে তার পিছন পিছন এসে হঠাৎ কী খেয়ালে মাইণ্ড চেঞ্জ করে উল্টোমুখো ঘুরে তার নিজের জায়গায় ফিরে গেছে। তবে কি যশুপর্ব বাদ দিতে হবে? সে হয় না। কাশীতে এসে ষাঁড় পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঘটনা পালটাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই।

এই সময় গলির মাথা থেকে হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল। আমাদের যে একটা ষাঁড়ের দরকার সে খবরটা ইতিমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দু-একজনকে বলেও দেওয়া হয়েছিল কাছাকাছি সন্ধান করতে। তাদেরই একজন একটা জাঁদরেল ষাঁড় দেখতে পেয়ে সেটাকে ধরে এনেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ষাঁড়ের মালিককেও ধরে এনেছেন। কিন্তু ক্যামেরা যেখানে দাঁড় করানো হয়েছে—অর্থাৎ দৃশ্যটা যেখানে নেবো বলে ঠিক করেছি—সেখানে ষাঁড়টাকে আনা যাবে না, কারণ ষাঁড় আর ক্যামেরার মধ্যিখানে গলির মুখটাতে একটা লোহার বেড়া রয়েছে, সেটার মধ্যে দিয়ে একটা মাঝারি সাইজের গরু ঢুকবে, কিন্তু ষাঁড় ঢুকবে না। গলির উল্টোমুখে বেড়া নেই, কিন্তু সেখান দিয়ে ষাঁড় আনতে হলে আরো চারটে গলি ঘুরে উল্টো দিক দিয়ে আনতে হবে। তাও আবার মাঝপথে যে ষাঁড় বেঁকে বসবেনা তার কী ঠিক? তাই আমরা ক্যামেরাটাকেই নিয়ে গেলাম বেড়ার ওপারে। দৃশ্যটা হচ্ছে এই—মগনলালের লোক ফেলুদা আর তোপসেকে নিয়ে ষাঁড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, ফেলুদা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখবে লালমোহন

ষাঁড়ের সামনে পড়ে থমকে গেছে। কারণ জিগ্যেস করাতে লালমোহন জানায় যে আটাত্তরে তার নাকি একটা ফাঁড়া আছে, এবং তার বিশ্বাস যে এই ষাঁড়ই সেই ফাঁড়া। ফেলু এগিয়ে তাকে ধমক দেওয়াতে কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে বাধা অতিক্রম করে লালমোহন হাঁপ ছাড়বে।

আমরা নতুন জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে একটা রিহার্সাল করব বলে তোড়জোড় করছি, এমন সময় লক্ষ করলাম যে জনতার মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কাশীর লোকেরা ষাঁড় জিনিসটাকে বেজায় ভক্তি করে। সেই ষাঁড়কে এতক্ষণ গলির মধ্যে আটকে রাখাতে তাদের মধ্যে থেকে আপত্তি উঠেছে। বুঝলাম রিহার্সাল-টিহার্সাল চলবে না। দুর্গা বলে কপালে যা থাকে করে শটটা নিয়ে নিতে হবে। মগনলালের নীল-শার্ট পরা লোক আর থ্রী মাসকেটিয়ার্স ষাঁড়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্যামেরা রেডি করে 'অ্যাকশন' বলতে তারা এগিয়ে এল সামনের দিকে। নীল শার্ট কাশীরই লোক, এই শ্রেণীর জানোয়ারে অভ্যস্ত, সে ষাঁড়টার পাশ দিয়ে যাবার সময় সেটাকে মৃদু ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ফেলু আর তোপসের জন্য পথটা একটু চওড়া করে দিল, ফেলু আর তোপসে দিব্যি বেরিয়ে গেল। লালমোহনের কথা ছিল ষাঁড়টাকে দেখে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়বেন, আর কথামতো দাঁড়ালেনও বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ষাঁড়বাবাজী হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে এমন ভাবে শিংনাড়া দিয়ে উঠলেন যে ভয়টা আর লালমোহনের অভিনয় করে দেখাতে হল না। ষাঁড়ের আস্ফালনে জটায়ু চোখ কপালে তুলে হাত পা ছুঁড়ে ছিটকে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। ফলে শটটা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তিনগুণ বেশি ভালো হয়ে গেল।

[আগামী বারে শেষ]

যেমন মা তেমনি ছা!

কিষণকান্তি শতপতি

বাচ্চা অবস্থায় একটি নীল তিমি Blue Whale ওজনে হয় প্রায় ৩০০০ কেজি। তার মা তাকে প্রতিদিন ৫০০ কেজি করে দুধ দেয়। এর ফলে বাচ্চা তিমি মাছটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং প্রতিদিন ১০০ কেজি করে তার ওজন বৃদ্ধি হয়। তিমি মাছের দুধ সবচেয়ে উন্নত ধরণের, এতে শতকরা ৩৫ ভাগ জল এবং বাকিটা কঠিন পদার্থ। অপরপক্ষে গরু ও মহিষের দুধে শতকরা ৯০ ভাগ জল ও ১০ ভাগ কঠিন বস্তু। তিমি গড়ে ৩০ বছর বাঁচে কিন্তু 'Fin' তিমি বলে এক প্রকার তিমি মাছ আছে যারা বহু বছর পর্যন্ত বাঁচে বলে শোনা যায়।

শিকার

হাওদা তুলে হাতির পিঠে
পাগড়ি এঁটে মস্ত গিঁটে
গন্ধশোঁকা কুকুর পুষে
বন্দুকেতে বারুদ ঠুসে
সঙ্গে শতেক সঙ্গীসাথী
আমায় নিয়ে চলল হাতি
সাহস ভরে বুকটি ঠুকে
দাঁড়াই আমি বন মুলুকে।
বাঘ সিংহী আছিস যারা
আজকে খাবি ভীষণ তাড়া
লুকিয়ে যারা ঝোপেঝাড়ে
বাঁচবিনারে বাঁচবিনারে !
আমার ভয়ে হেথাহোথা
জীবজানোয়ার ভাগল কোথা
বলত কুকুর গন্ধ শুঁকে—
দাঁড়াই আমি বুকটি ঠুকে।
বাঁধনা মাচা বেশটি করে
অস্ত্র ধরে কাঁধের পরে
বসব মাচায়, সেটাই প্রথা।
তোলনা আমায়, মইটা কোথা ?

বেশটি হল গুছিয়ে বসা,
জানোয়ারের গ্রহের দশা
ঘনিয়ে আসে তাড়াতাড়ি।
(বন্দুকটা বেজায় ভারি !)
পিটিয়ে দেদার ক্যানেস্তারা
কাঁপিয়ে দেবে বনের পাড়া,
নেকড়ে ভালুক ব্যাঘ্রশাহী
করব আমি ধরাশায়ী !
সামনেতে কি আসছে ওটা
মুখটা সরু লেজটি মোটা ?
হাঁকছে ভীষণ হুঙ্কা রবে
কি ভয়ানক জন্তু তবে !
আসুক তেড়ে ডরাই থোড়া
গঙ্গা বলে টিপছি ঘোড়া।
বাপরে গুলি ছটকে ছুটে
দিব্যি গেল শূন্যে উঠে !
দড়াম করে চমকে পিলে
ভুঁয়ের পরে শুইয়ে দিলে !
টুটল কোমর ভাঙ্গল মাচা—
আছিস কেরে আমায় বাঁচা !

প্রণব মুখোপাধ্যায়

গোপালী নন্দী

রথের মেলা

বাজনা বাজে রথের মেলায় ঘুরছে নাগরদোলা
খাঁচায় বসে ময়না পাখি টিয়েটা লেজ ঝোলা।
পাঁপড় ভাজে রসিক বুড়ো বাগিয়ে লোহার কড়া
তেলের জন্যে দামটা যে তার বেজায় রকম চড়া!
ঠাকুর দাদা ধরেছে হাত রথ দেখে যায় বুড়ি
গাছের তলে মেয়েরা খায় আলুর চপ আর মুড়ি।
পুতুল বেচে বোষ্টমি বউ গায়ে রঙীন জামা
হাজরা বুড়ো আনছে চিঁড়ে বোঝাই দুটো ধামা।
থালায় ভরা মিষ্টি নিয়ে সাতকড়ি পাল হাঁকে
তাই না দেখে দুষ্টু খোকন বায়না ধরে মাকে।
স্বপন বাবু ম্যাজিক দেখায় চিমটি তাসের বাজি।
সত্যপীরের গানটা শোনায় আল্লারাখা হাজি।
নয়ন দাদা পাগড়ি মাথায় হাতে বাঁশের লাঠি
সাঁওতালরা মাদল বাজায় শক্ত দুটো কাঠি।
ঠাকুর নিয়ে রথের মাথায় বামুন পাড়ার বুড়ো
খাটিয়ে ছাতা পয়সা কুড়োয় চটুয্যেদের খুড়ো।
রথ চলেছে রাজার মতন সামাল সামাল রব
বাংলাদেশে নাইকো এমন মজার মহোৎসব॥

অসিতবরণ হাজরা

॥ বর্ষাবিন্যাস ॥

গ্রীষ্মের ছুটি গ্যালো, ফিরে এলো বর্ষা,
আকাশটা নেই আর সে রকম ফর্সা!
কালো-চোখে জ্বলে তার বিদ্যুৎ-বহ্নি,
চাষী ভাই বলে 'আহা! হয়ে গেছি ধন্যি!'
শুকনো সীমানা ভরে সবুজের জেল্লায়,
ব্যাংগুলো গাংপারে উল্লাসে চেল্লায়!
হাস তো পাতালে নেই: জলে ভাসে মর্তে,
শেয়াল শত্রু তার—আছে ঝোপে, গর্তে।
ঘুমন্ত নেই আর সাপ-খোপ কিচ্ছু.
এ সময় ফুটো ফাটা-কাঁকে থাকে বিচ্ছু।
ছেঁড়া-ছুটো, ভাঙা চোরা ছাতা সারা-হচ্ছে,
কাঁকড়া, গুগ্‌লিগুলো বাজারে বিকোচ্ছে!
গরীবের মহা জ্বালা। গড়বড় মামলা,
এদিকে বাল্‌তি পাতে, ওদিকেতে গামলা।
নইলে যে এক্ষুনি ক্ষুদে বারি-বিন্দু
ঘরেতে বইয়ে দেবে ছোটোখাটো সিন্ধু!
জল, কাদা আর সদা ঝম্‌ঝম্ ছন্দ;
সব জুড়ে বেশ লাগে খিচুড়ির গন্ধ!

লীলা মজুমদার

যদি খোঁজ নিতে পার, তাহলে দেখবে প্রত্যেক বছরই পৃথিবীর কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বার্ষিক উৎসব হচ্ছে। হয়তো একশো কি দুশো, পাঁচশো এমন কি কিছু কাল আগে গৌতম বুদ্ধের জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্তির উৎসব হয়েছিল। আর পৃথিবীর কথা তো ছেড়েই দিলাম, অন্য অনেক দেশের তুলনায় কত ছোট এই আমাদের বাংলার কথাই ধর না: দেখবে প্রতি বছরই এখানকার কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের পর একশো কি দুশো বছর কেটে যাবার কথা সকলে মনে করছে।

এই ১৯৭৮ সালটাই ধর না কেন। ঠিক দুশো বছর আগে, ১৭৭৮ সালে, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা প্রথম বাংলা হরপে বই ছেপেছিলেন। তার জন্য এ-বছর নানা অনুষ্ঠান হবে।

আরো আছে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম সভা বা ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮৩৩ সালে তিনি মারা যান। পরে সেই ব্রাহ্ম সমাজকে ভাল করে গড়ে তুলেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের বাবা। তিনিও একজন পণ্ডিত মহাপুরুষ ছিলেন।

রামমোহন নিরাকার এক ভগবানের পূজোয় বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাসের কথা উপনিষদে আছে; তিনি চেষ্টা করেছিলেন মূর্তি পূজোর বদলে সেই নিরাকার পর ব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ নাম তাঁর দেওয়া। কিন্তু তিনিও জানতেন এটা কোনো নতুন ধর্মই নয়, এ হল পুরনো বেদান্তের ধর্ম। কাজেই ব্রাহ্মরা অ-হিন্দু নন্। তা গোঁড়া হিন্দুরা সে-কথা মানবেন কেন? তাঁরা বলতেন, "ঠাকুর পূজোই যদি না করল, তবে আবার হিন্দু কিসের? দাও সব এক-ঘরে করে।" তাই করা-ও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মরা বাধ্য হয়ে নিজেদের একটি উদার ও আধুনিক সমাজ গড়লেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাত মানতেন। তাঁদের পৈতে ছিল; তাঁদের পরিবারের ক্রিয়া-কর্মে কোনো মূর্তি থাকত না বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পৌরোহিত্য করতেন না। তাঁদের সমাজের নাম ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজ।

এর পঞ্চাশ বছর পরে, ১৮৭৮ সালে সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস এবং আরো অনেকে মিলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তারই এবার শতবর্ষপূর্তি উৎসব হচ্ছে।

এর আগে ভারতবর্ষীয়, ব্রাহ্ম সমাজ, কিম্বা নব-বিধান সমাজ অনেক সৎকাজ করেছিলেন। তাঁদের নেতার নাম ছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁরাই প্রথমে জাতিভেদ উঠিয়ে দেন।

ধর্মের দিক দিয়ে সেরকম নতুন কিছু প্রবর্তন না করলেও, লোকসেবার দিক দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ যা করেছে, তার মূল্য হয় না। রামমোহনকেই আধুনিক ভারতের প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। তাঁর চেষ্টায় এ-দেশে সংস্কৃত পড়া ছাড়া উদার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া সতীদাহ বন্ধ করা, স্ত্রী শিক্ষার আর স্ত্রী স্বাধীনতার প্রবর্তন করা, পরদা-প্রথা দূর করা, দুর্গত ত্রাণের নিয়ম তৈরি করা—এককথায় জনসাধারণের যাবতীয় দুঃখ মোচনের জন্য একদল সৎ-সাহসী আর আদর্শবাদী হিন্দু নেতাদের আর খৃশ্চান মিশনারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সেকালের ব্রাহ্মরা সমস্ত ভারতবর্ষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে টেনে একেবারে জ্ঞানের আলোতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই হিন্দু নেতাদের মধ্যে সবার আগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম করতে হয়। বলতে গেলে এটা শুধু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শতবর্ষপূর্তির উৎসব নয়, সারা ভারতের জেগে ওঠার শতবার্ষিকী উৎসব।

ছড়া

রেবন্ত গোস্বামী

বেচারাম লাল মহাশয়
খাট বেচে মাদুরেতে শোয়।
মাদুর বেচে শোয় মাটিতে
বৌকে সোনার বাউটি দিতে।

*

কাক ডাকে কা।
আমি খাব দুধ আর
বাবা খাবে চা।
টুংটাং টুংটাং
চিনি দেয় মা।
আমি রোজ দুধ খাই
বাবা খায় চা।

*

সোনামণির রথ
পেরিয়ে যাবে সাগর নদী
তেপান্তরের পথ।
রথ চালাবে কে ?
মিনি-ঘোড়া তুতু-ঘোড়া
লাগাম বেঁধেছে।
কোথায় যাবে সোনা ?
কোথায় আবার—মায়ের কাছে
রান্নাঘরের কোনা।

*

তিনকড়ি রায় কুমড়ো খায়,
পালকিতে বৌ আনতে যায়।
ঘর ছাড়া কি বৌ মানায় ?
খোল দিয়ে তাই ঘর বানায়।

মহিষ দেবতা

বেনু গঙ্গোপাধ্যায়

গরুকে আমরা দেবতার আসনে বসিয়েছি। ছোট ছোট মেয়েরা গো-পূজা করে আমাদের দেশে। পাঁজিতে শ্যামা পূজার পরের দিন গো-পূজার উল্লেখ আছে। কিন্তু মহিষ? মহিষকে কেউ পূজা করে কি? সেই কথাই বলছি।

হিমালয়ের পথে মৈখণ্ডা চটিতে পৌঁছলাম, মৈ মানে মহিষ। এই মৈখণ্ডাতে দেবী ভগবতী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। এখানের লোকেরা ঐ প্রবাদে বিশ্বাস করে। যে দিকে তাকাই, দেখি পাল পাল মহিষ। এরা যাযাবর। শুধু এরা নয়, এদের পালকেরাও। পথে পথেই এদের জীবন কাটে। ঠাঁইও নেই, ঠিকানাও নেই এদের, এরাও আমাদের মত কেদার-বদরী যাত্রী। আমরা যেখানে সেখানে রাত কাটাচ্ছি; এরাও তাই। এখন বৈশাখ মাস, যাত্রীর মরশুম, সেই সঙ্গে এদেরও। এর ই তো দুধ যোগান দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। নানা রকমের দুধের তৈরি জিনিস আমরা খেয়ে চলেছি, কখনও দই, কখনও পেঁড়া, কখনও ক্ষীর, কখনও শক্ত মোয়া। গরু এ পথে নেই, থাকা সম্ভবও নয়, ওরা এতো কষ্ট সহ্য করতে পারে না; মহিষ কষ্টসহিষ্ণু, তাই ওরাই টিঁকে থাকে এই পাহাড়ী পথে।

হয়ত প্রয়োজনের খাতিরে মহিষই প্রিয় উত্তরাখণ্ডে। তাই দেবতার আসন পেয়েছে ওরা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবরাও অনেক মানুষ মেরেছিলেন। সেই পাপ দূর করার জন্য তাঁরা কাশীতে গেলেন বিশ্বনাথ দর্শন করতে, বিশ্বনাথ দিলেন শেয়াল-ফাঁকি, তিনি একেবারে গুপ্ত কাশীতে গিয়ে হাজির, পাণ্ডবেরাও নাছোড়বান্দা। তাঁরাও ছুটলেন পিছু পিছু। কেদার বদরীর পথে পড়ে গুপ্তকাশী, পাণ্ডবেরা এলেন গুপ্তকাশীতে, তাঁদের দেখে শিব আবার দে ছুট। ছুটতে ছুটতে একেবারে কেদারনাথ পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে হাজির। আর তো যাবার পথ নেই। শিব পড়লেন ফাঁপরে, এদিকে পাণ্ডবেরা পিছু পিছু তেড়ে আসছেন;—এখন উপায়? আত্মগোপন? তাই করলেন শিব, মহিষের রূপ ধরলেন, কিন্তু তাতেও সুবিধে হ'ল না। পাণ্ডবেরাও তো আর কেউকেটা নয়, তাঁরা চিনে ফেললেন মহিষরূপী মহাদেবকে।

সামনেই প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গে মহিষরূপী মহাদেব ঢুকে পড়লেন। ইচ্ছেটা পাতালে পালাবার, কিন্তু মহিষের সব শরীরটা পাতালের সুড়ঙ্গপথে ঢোকার আগেই ভীম এসে হাজির। ভীম চিরদিনই গোঁয়ার সে দু'হাত দিয়ে মহিষের পেছনটা ধরে ফেললে, হার মানলেন মহাদেব। একবার কিরাতরূপী মহাদেবকে কাবু করেছিলেন অর্জুন; এবার মহিষরূপী মহাদেবকে জব্দ করলেন ভীম। অগত্যা বর দিতে হল মহাদেবকে। তিনি পাষাণ হয়ে রইলেন কেদারনাথ পাহাড়ে, মহিষের পেছন অংশটুই হলেন শ্রীকেদারনাথ।

শ্রীকেদারনাথই হলেন মহিষ দেবতা।

গল্প হলেও সত্যি!

বিখ্যাত মার্কিন হাস্যরসিক মার্কটোয়েন এবং তাঁর বন্ধু চলি ডেপিউ একই জাহাজে একবার বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। পথে একদিন তাঁদের নিমন্ত্রণ হ'ল জাহাজের এক ভোজ সভায়। 'ডিনারের পরে দুজনকেই কিছু বলতে হবে' কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন আগে থেকে। খাওয়া শেষ হতেই মার্ক টোয়েন প্রায় কুড়িমিনিট ধরে মজার মজার গল্প ব'লে সভার লোককে হাসিয়ে মারলেন; তিনি যখন বসলেন তখনও শ্রোতারা তাঁকে থামতে দিতে চায় না, হাততালির আর এনকোরের ঝড় বইল। চলি দেখলেন, এরপর তাঁর কোনো কথাই জমবে না। তাই তিনি উঠে বললেন, 'বন্ধুগণ, ভোজসভায় আসবার আগে মার্ক টোয়েনের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত হয়েছিল, তাঁর বক্তব্যটা আমি ব'লব আর আমার বক্তব্যটা তিনি আপনাদের শোনাবেন। মার্ক টোয়েন আমার বক্তব্য খুব সুন্দর ভাবেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছেন, এবং আপনারা তুমুল হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন, আমার সেজন্য কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি মার্ক টোয়েনের বক্তব্য বলতে উঠে দেখছি তাঁর কাছ থেকে যে নোট নিয়েছিলুম সেটা হারিয়ে ফেলেছি এবং তাঁর যা বলবার ছিল সব ভুলে বসে আছি। অগত্যা তাঁর বক্তব্য আপনাদের শোনাতে পারলুম না, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।' শ্রোতারা তুমুল হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁর ঐ মিথ্যা কথাটিকে সংবর্ধিত করলেন, মার্ক টোয়েনও হাসিমুখে তাঁকে বোকা বানাবার সেই চেষ্টার রস উপভোগ করলেন।

রাতবিরেতে
১০
সুবীর রায়
তিনটেই দেখছি বেহুঁশ হয়ে আছে! ব্যাপারটা কি?
যাহোক, ও নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে — আগে হতচ্ছাড়াদের চালানের ব্যবস্থা তো করি...
...যতসব ভুতুড়ে ব্যাপার... গাছের শিকড়ে পা জড়িয়ে এসে পড়লাম সুড়ঙ্গে, সেখান থেকে কে হ্যাঁচকা ধরে টেনে নামাল অথচ এই তিনটে বেহুঁস ডাকাত ছাড়া কারো দেখা নেই — হুঁঃ!
কিন্তু চুরি যাওয়া মেয়েটা গেল কোথায়? — এই হতচ্ছাড়া বীরু!
?
চুরি যাওয়া মেয়েটা...
পেছনের জঙ্গলে থেকে মানুষের গলা পেলাম যেন..
!
সো-সো-সো সোনা!
সোনামা!!
বা — বা! বাবা!!
খুকু! কি হয়েছিলরে? ডাকাত ধরেছিল?
(এহুম) আ-আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর*
* বিক্রমের নকলে

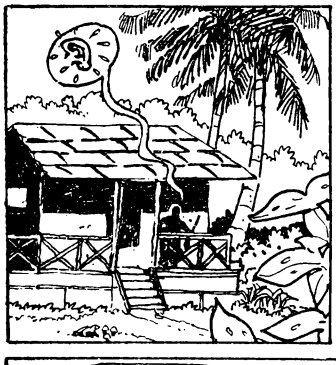

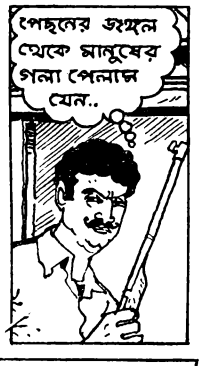

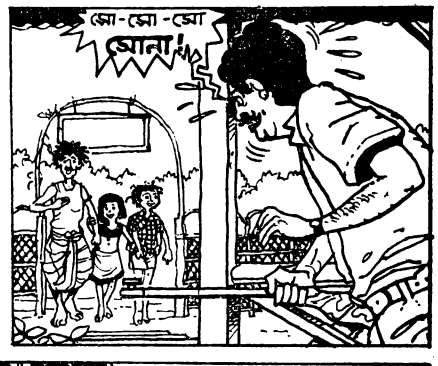

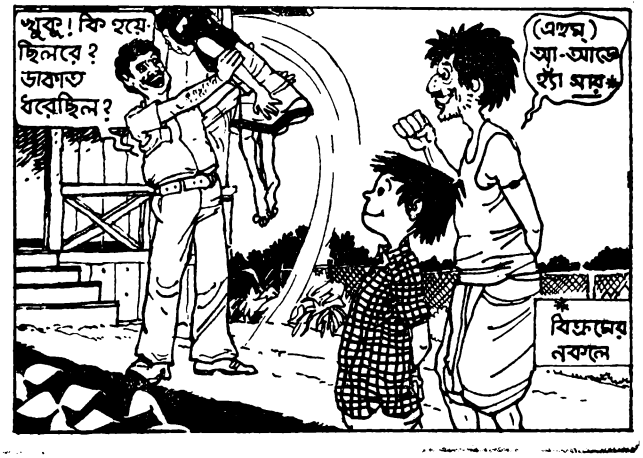

(ভেঙচে) ধীরু ওস্তাদ স্যার*- আমরা বের করে এনেছি!
*বিক্রম-এর নকলে
বলিস কি? তোরাই ডাকাত নোস তো?
না না বাবা, কেউ ডাকাত নেই! দাড়িওয়ালা এক-জন শুধু ম্যাজিক করে খরগোস বানাতে পারে ওখানে!
আরে সে-ই তো ধীরু! ব্যাটা শুনেছি হিপনো-টিজম জানে।
এইবার একবার হাতে পেলে রাস্কেলটাকে আমার কিছু ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়ব!!
এবার তাহলে আমরা স্যার*...
*ঐ
আরে রোসো রোসো! মেয়েকে ফেরৎ নিয়ে এসেছো তোমরা দুজন — তোমাদের তো হাজার টাকার...
...পুরস্কার পাওনা আছে হে!
তখন, একটু দূরেই...
চন্দন! ওহে চন্দন!
?
কে?
মাস্টারমশাই! এত রাত্তিরে!
সর্বনাশ হয়েছে হে চন্দন! শিগ্গীর বাইরে এসো!
তখন টেলিফোন করে তুমি যে উড়ন্ত পিরিচের কথা বললে-সে তো আসলে আমার মহাকাশ-যান! বিক্রম — আমার কলের মানুষ, ওটাতে চেপে পালিয়ে এসেছে!!
সেকি! তা'লে সত্যি সত্যি ইউ.এফ.ও. নয়?
না-না! এসো — দুটোকেই খুঁজে বের করতে হবে!
জঙ্গলের ঐ দিক-টায় ওটাকে শেষ দেখা গেছে!

ঐ যে স্যারেরা ফির-ছেন....
দেরী করলেন যে স্যার? হাতে আবার ওটা কি এনেছেন?
পু-পু-পু-পু-পুরস্কার!!! হাজার টাকা!!
পুরস্কার = হাজার টাকা = রট্ রট্!
রট্, রট্ রট রট রট্ - হেঃ হেঃ বুঝেছি
কি হল? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?
রট্ রট্ রাট্ রাট্ হেঃ হেঃ
প্রভু!
এই স্টুপিড! মুচ্ছো যাবিনা বলছি!!
এবার বল, উড়োযন্তরে চেপে পালিয়ে এসেছিস কেন?
হয়ে...মানে... আমার,মানে..
খিক খিক খিক খিক
..মহাকাশপাড়িদিতেভারীভয়!!!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সে-তো আগেই বুঝেছি। মহাকাশ আর যাবনা —তুই শুধু ঘরে চল!
মহাকাশে যাবেননা? সেকি মাষ্টারমশাই!
নাহে চন্দন! ....বাড়ী থেকে এই খালিদ-পুরের জঙ্গল মোটে দশমাইল রাস্তা তো?
তো-এটুকু আসতেই মোট ছবার পথ হারিয়েছি আমি – জানো?
এরপরেও আর মহাকাশ পাড়ি দিই কোন লজ্জায় বলো?
শেষ

ছোটদের জন্য এইচ এম ভি'র উপহার

হিংসুটে দৈত্য

অসকার ওয়াইল্ডের সেই হিংসুটে দৈত্যের গল্প জানো তো? সেই যে, এক ছিল ভারি হিংসুটে দৈত্য। তার মস্ত সুন্দর বাগানে ছোটদের ছিল ঢুকতে মানা। তারপর একদিন একটি ছোট্ট ছেলে এসে দৈত্যের মনটাকে একদম বদলে দিল।

কী করে? তাহলে তো এই নতুন গীতিনাট্যের রেকর্ড সবটা শুনতে হয়। এইচ এম ভি'র এই নতুন লং প্লে রেকর্ডটির জন্যে হিংসুটে দৈত্যের গল্প বিশেষ ধরনে রচনা করেছেন ভাস্কর বসু। সুধীন দাশগুপ্তের মন-মাতানো সুরে এতে অংশ নিয়েছেন ছোটবড়ো সকলের প্রিয়শিল্পী মান্না দে, অংশুমান রায়*, অশোক রায় আর তোমাদের মত ছোট ছোট অনেক ছেলেমেয়ে—তাদের সকলের নাম রেকর্ডটিতেই আছে।

ছোট্ট শ্রোতারা আজই এইচ এম ভি ডিলারের দোকান থেকে এই রেকর্ডটি আনিয়ে নাও। তারপর সকলে মিলে হৈ হৈ করে মজার কাণ্ডকারখানা শোনো।

*হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস লি:-র সৌজন্যে

HMV

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

চিহ্ন

জীবন সর্দার

শিলাবতী নদীর তীরে কানতোর একটা ছোট্ট গ্রাম। তাকে বাঁয়ে রেখে নদীর উজানে এক কিলোমিটার গিয়ে জয়প্রভা যেখানে শিলাবতীতে এসে মিলেছে সেখানে পৌঁছে গেলাম। পৌষ মাস। নদীতে একহাঁটু জল। খানিক সময় শিলাবতীর তীরে কাটিয়ে, হাঁটুজল ভেঙ্গে জয়প্রভার চরায় এলাম।

এক আঁজলা জয়প্রভার জল তুলে শিলাবতীর রং এর সাথে ফারাক কিছু পেলাম না। দুই নদীর তীরে বালু দেখেও কিছু হেরফের বুঝলাম না। জয়প্রভা বোধহয় একটু বেশি ঢাল বেয়ে বইছে, তার স্রোত কড়া, শিলাবতীর ততটা নয়। দুটো নদী যেখানে মিলেছে, চর যেখানে তিন-কোণা, জয়প্রভার ধার ছেড়ে সেখানটাতে আমি শিলাবতীর ধারে ফিরলাম। পশ্চিমের সূর্য আমার মুখোমুখি হলো।

মুখ নামিয়ে বালুতে চোখ রেখে হাঁটছি। ওটা কিসের চিহ্ন! আমি থামলাম। একটানা ফিতের মত নকশা আঁকা—নরম বালুর বুকে একটা সাপ একেবেঁকে যাবার সময় চিহ্ন রেখে গেছে। জল এড়িয়ে গেছে সাপটা নাকি জল সাঁতরে ওপার থেকে এপারে এসেছে? কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে—জানার জন্য আমার মনটা গোয়েন্দা হয়ে উঠলো।

সাপটা এসেছে স্রোত বরাবর পশ্চিম থেকে পুবে। তার চলার চিহ্ন যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে উঁচু ডাঙ্গা ভেঙ্গে পড়েছে নদীতে। নদী পার হয়ে এলে এখানে চিহ্ন

বারিকণার কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে। জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতিস্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগাররূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্ধ্বভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহার ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুলজটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নেই, শেষ নেই।

পেতাম একটু কিছু। জলের ধারে ধারে এক ঠেঙ্গে একটা পাখির পায়ের ছাপ পেলাম। একটা পায়ের আঙুলের ছাপ স্পষ্ট, আর একটা পা যেন হিঁচড়ে নিয়ে গেছে। মানুষ জন এদিকে কেউ আসে না, দূরে আরো পশ্চিমে, গ্রামের লোক যে পথে পারাপার করে, সেদিকে কিছুটা গিয়ে ফিরে এলাম। নদীর তীর থেকে উঁচু ডাঙ্গায় উঠলাম। উপরটা ঘাসে ঢাকা মাঠ। আমি উঠে দাঁড়াতেই মাথার উপর মাঠচিলের ডাক শুনলাম। পাখিটা ঘুরে ঘুরে সঙ্গমের দিকে গেল, তারপর শিলাবতী পেরিয়ে গ্রামের দিকে।

বাজপাখিটা চলে যেতেই একঝাঁক কাদাখোঁচা উড়ে এলো সঙ্গমের দিকে। একটা রহস্যের সমাধান আমার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। আমি ঝপ করে উঁচু ডাঙ্গা থেকে নদীর চরায় নাবলুম। ভাবলুম সাপটাও ঠিক এইভাবে মাঠ থেকে নদীতীরে নেবে এসেছিল। আমি যেভাবে গুটি গুটি চিহ্ন দেখে দেখে এগোচ্ছি, সাপটাও তেমনি আহত পাখিটাকে তাক করে একেঁবেঁকে এগিয়েছে। একটু দূরত্ব রেখে। যেখানে এসে আমি দাঁড়ালাম, সাপটাও সেখানে থেমেছিল। তারপর আর চিহ্ন নেই সাপের চলার। পাখিটাও সেখানে থেমেছিল, তারপর আর একঠেঙ্গে পায়ের চিহ্ন নেই। নদীর জল এখানে একটু ভেতরে ঢুকে গর্তের মধ্যে শান্ত হয়ে রয়েছে। তাতে শেওলা জমেছে। পাখিটা হয় এখানে এসে উড়ে গেছে, নয়তো সাপের দিকে গেছে। যদি তার ডানাও জখম হয় তবে তো সাপের মুখের পাশ দিয়েই তাকে যেতে হয়েছে। তখন কি বাজপাখিটা ধারে কাছে ছিল! তার কোনো চিহ্ন নেই। না সাপ না কাদাখোঁচা, ধারে কাছে কোথাও কারো চিহ্ন পেলাম না!

আমি আর কিছু বলতে পারছি না, কেননা আর কিছু দেখিনি। আমি কোনো ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি এইরকম চিহ্ন দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়। আর বলতে চাইছি প্রকৃতি-পড়ুয়াদের কাজ অনেকটা গোয়েন্দাদের কাজের মত।

খবর পেলাম

সমুদ্রের কচ্ছপের ডিম পাড়ার সবচেয়ে বড় আড্ডা বোধহয় মহানদীর মোহনার কাছাকাছি। কটক জেলার ভিতরকণিকা ও অষ্টরঙ্গ বেলাভূমিতে। জায়গা দুটি এখন সরকারের অনুমোদিত কচ্ছপদের জন্য 'নিভৃত আবাস'। গত বসন্তে এখানে প্রায় দেড় লক্ষ কচ্ছপ ডিম দিতে এসেছিল। তাদের সবাইকে সরকারী সংরক্ষণকারীরা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছেন। খবরের আর একটি সূত্রে প্রকাশ এখানে আগমনকারী কচ্ছপদের কয়েকটির গড়ন পরীক্ষা করে এদের প্রজাতি জানা গেছে; বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের বলে—লেপিডোচেলিয়া অলিভেসি (Lepidochelya Olivacea); প্রশান্ত মহাসাগরীয় কচ্ছপ বা অলিভা রিডলী নামেও এদের পরিচয় দেয়া যায়।

এই ব্যাপারে আরও খবরের জন্য স্থানীয় প্রকৃতি-পড়ুয়াদের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(১) **সুজন দত্ত, ৬৮৪, বয়স ১৫½**

কত চিঠি আসে, কত কথা নিয়ে,
সব কথা শুনি এক মন দিয়ে।
কথায় কথায় কথামালা হয়ে,
আনন্দের ফুল ফুটুক হৃদয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব লেখাই অনেকবার এখানে ওখানে ছাপা হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে যদি কাউকে কিছু লিখে দিয়ে থাকেন, তার কথা জানি না। পূজার সন্দেশে অন্যান্য কাগজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া, অন্য কোথাও অপ্রকাশিত একটি ইংরিজি নাটিকার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়েছিল মনে আছে কি? শ্রী জগদিন্দ্র ভৌমিক চমৎকার ভাষায় মূল লেখার রস রেখে, বাংলা করে দিয়েছিলেন। ভালো লাগেনি? রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনা আমাদের ছেলেমানুষ গ্রাহকদের জন্য সহজ করে অবিশ্যি বলা যায়।

(২) **তারাশঙ্কর গুপ্ত, ১৩৪০, বয়স ১২**

দেখ, ছোটদের সেরা মাসিকপত্র বলতে কোনো সত্যিকার মাসিকপত্রের কথা লেখার কি দরকার আছে? আমরা শুনতে চেয়েছিলাম তোমাদের মতে ছোটদের সেরা মাসিকপত্র কেমন হওয়া উচিত। আর তোমার মতে যদি সন্দেশের চাইতে ভালো "একটি দুটি" মাসিকপত্র থাকে, তাদের প্রশংসা করলে আমরা অসন্তুষ্ট হব, এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ ভেবে পাচ্ছি না। সেগুলির কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারতে। সবচেয়ে ভালো লেখা ও যুক্তিযুক্ত কথা হলে পুরস্কার পাওয়াতে বাধা কোথায়? সন্দেশের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে তোমার এত হীন ধারণা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

তুমি চিঠি লিখে তোমার বয়স ও গ্রাহক সংখ্যা দিয়ে যাকে লিখছ তার নাম ও কার্যালয়ের ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিও। আমরা রি-ডাইরেক্ট করে দেব। বিদেশের গ্রাহকদের চিঠি তো আর এমনি ডাকের খামে দিলে হবে না। কাজেই অসুবিধা আছে। নলিনীদিকে ডবল পোস্টকার্ড লিখে জেনে নিও কি করা যায়। শতরঞ্জ কি খিলাড়ি অন্য অনেক জায়গায় দেখানো হয়েছে, এখানেও হবে। এখন কোন ছবি হচ্ছে সে তো সম্পাদক মশাই নিজেই লিখেছেন।

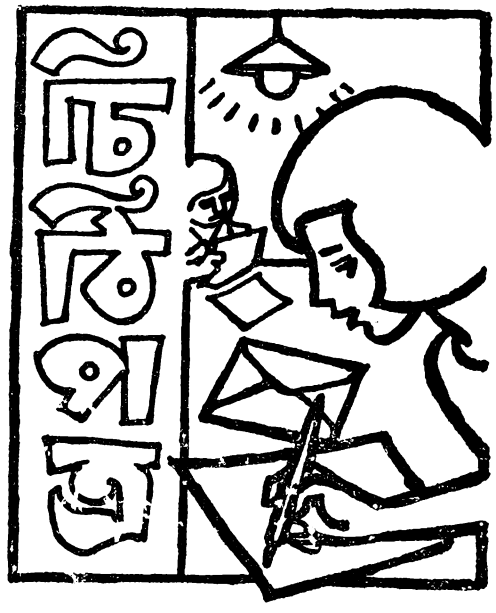

(৩) **সুনন্দা ও সৌমিত্র মল্লিক অভিজিৎ রায়-চৌধুরী ২২৪৫, বয়স ১২, ১৭, ৮**

তোমাদের সুন্দর কার্ড পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমরা ও অন্য সব গ্রাহকরা আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও।

(৪) **সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১২, সাবলপুর প্রাইমারি স্কুল, মুর্শিদাবাদ।**

দেখ, ভাই, তোমার লেখার শখ আছে ভালো কথা, কিন্তু আগে বাংলা ভাষাটাকে আরেকটু রপ্ত কর, তার পরে তো সাধারণ বিভাগের জন্য লিখবে। 'ভালোবাসি'কে 'ভালোবাসী', 'আমি চাই'-কে দু জায়গায় 'আমি চায়' লিখলে কি চলে? হাতপাকাবার আসরে আরো লেখা পাঠাও, ভালো হলে, শুধরে ছাপিয়ে দেব। খেলাধূলার কথা তো প্রত্যেক সংখ্যায় থাকে, কখনো বেশি, কখনো কম। জেলা স্কুল বোর্ডের অর্ডার দেরীতে এলে পাঠাতে দেরী হয়। এবার মাসে মাসে পাবে।

(৫) **মধুলেখা চৌধুরী, ৫৭৬, বয়স ১৫**

হাতির আর গরুর গল্প হাত-পাকাবার আসরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সুন্দর গল্প। আরেকটা কথা, ভূতের

গল্প যদি সত্যি উপভোগ করতে চাও, তাহলে নিছক গল্প মনে করেই পড়বে। সত্যি মিথ্যা বিচার করতে যেও না। এ তো আর ইতিহাসের বই নয় যে তথ্যগত সত্যটাই বড় হবে। সব ভূতের গল্প বিশ্বাস করা কিন্তু বুদ্ধির কাজ নয়। তোমাদের বড় সম্পাদিকা এতাবৎ রেডিওর জন্য আর নানা পত্রিকাতে ৫০-এর বেশি ভূতের গল্প লিখেছেন এবং—শুনে রাখ—তার প্রত্যেকটি বানানো! তিন সম্পাদককে, এমন কি দুজনকেও এক সঙ্গে পাওয়া খুব শক্ত কাজ, ভাই। ও সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। কার্যালয়ে গিয়ে ছোট সম্পাদিকাকে হাতে লেখা পত্রিকাটা দেখিয়ে এসো একদিন।

(৬) **সোহিনী সোম, ২০০০, বয়স ১৩**

মধুলেখাকে ভূতের গল্প সম্বন্ধে কি লিখেছি পড়ে দেখ। সব দেশেই, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে নানারকম ভৌতিক কিংবদন্তী থাকে। স্থানীয় লোকরা হয়তো সেগুলো বিশ্বাস-ও করে। এ-সব গল্পের নিজস্ব একটা রস থাকে, সেইটে উপভোগ করতে হয়।

(৭) **সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, ৮৫৩/১৩ই বছর**

কিংকং ছবির বড় সমালোচনা অন্য কোথায় দাও, ভাই। পুরনো মলাট আবার ছাপার কথা তো পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছিল। তাকে খুঁত বলছ কেন? নতুন মলাটও পাবে।

(৮) **সুগত, সুগীতা, সঙ্গীতা ত্রিপাঠী, ২৩৩৮ বয়স ৯ই, ১১, ১৩ই**

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের পত্রিকা পেয়েছ আশা করি। এই তো উত্তর পেলে।

সব সময়ে মনে রেখো

* সন্দেশ বেরোয় বাংলামাসের মাঝামাঝি,—তার মানে, ইংরেজি মাসের একেবারে শেষে।
* পরের ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহেই তোমাদের বই পেয়ে যাবার কথা।
* দ্বিতীয় সপ্তাহেও যদি না পাও, তখনই তোমাদের এলাকার **Suptt. of Post Offices**কে নালিশ জানাবে লিখিতভাবে।
* লিখে দিও যে মাসের (ইংরেজি) শেষে রাসবিহারী এভিনিউ পোঃ অঃ থেকে বই **Under Certificate of Posting** পাঠানো হয়েছিল।
* এই নালিশের কপি পাঠালে তবেই আমরা ডুপ্লিকেট বই পাঠাব।
  মাসের প্রথম থেকেই সন্দেশ পাইনি বলতে থাকলে ডুপ্লিকেট পাঠাব না কিন্তু।

* হাতপাকাবার আসর কেবলমাত্র ১৭ বছরের কম বয়স্ক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য।
* সন্দেশের পছন্দ অনুযায়ী ছড়া, ছবি, গল্প, ধাঁধা ইত্যাদি ছাপানো হয়।
* কাগজের একদিকে পরিষ্কার করে ছাপার জন্য লিখবে।
* ছবি আঁকবার সময় কেবল কালো কালি ব্যবহার করবে।
* সন্দেশের গ্রাহক ক্লাব/স্কুল বা লাইব্রেরির ১৭ বৎসরের কম বয়সের ছাত্র/মেম্বাররাও এই আসরে যোগ দিতে পারবে।
* নাম, বয়স ও গ্রাহক নং স্পষ্ট করে লিখবে।

জানোয়ারের গল্প

মধুলেখা চৌধুরী—৫৭৬/১৫ বছর

কিছুদিন আগে একটা সকালবেলা বেশ মজার ঘটনা ঘটেছিল। পড়তে বসব কিনা ভাবছি এমন সময় আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে সে এসে বলল, রাস্তায় নাকি একটা হাতি এসেছে। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি ততক্ষণে রাস্তার এক জায়গায় বেশ ভিড় জমে উঠেছে, আর ভিড়ের মাঝখানে সকলের মাথা ছাড়িয়ে, হাতি মহারাজ স্বয়ং দাঁড়িয়ে। মাহুত ওকে আস্তে আস্তে হাঁটাচ্ছে, অনেক লোকে পয়সা দিচ্ছে, হাতিটা শুঁড়ে করে সেগুলো মাহুতকে দিয়ে, সেলাম করছে।

হাতি ছিল আমাদের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে তাই মাহুতকে বলে পাঠিয়ে আমরা তাকে একেবারে বাড়ির সামনে নিয়ে এলাম। আমরা একতলায় থাকি তাই হাতিকে একেবারে কাছেই পাওয়া গেল। সে সামনের দুপা ফুটপাথে আর পেছনের পা দুটো রাস্তায় রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ানক দুলতে লাগল।

আমরা হাতিকে পয়সা দিলাম তারপরে কলা আর সফেদা খেতে দিলাম। হাতিটা এদিকে খাবারের লোভে এত এগিয়ে এসেছিল যে আমাদের ঘরের দরজা জুড়ে তার মস্ত মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছিল আর আমাদের ঘরের একেবারে মাঝখানে তার লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে দোলাচ্ছিল। একটা খাবার দিয়ে আরো আনতে যা সময় লাগছিল তাতেই অধৈর্য হয়ে আরো জোরে জোরে শুঁড় দোলাচ্ছিল ও। তখন কিন্তু খুব ভয় করছিল আমাদের। হাতির হাসি-হাসি চোখ দুটোকেও মনে হচ্ছিল যেন রাগী-রাগী!

এরকম দৃশ্য কেউ না দেখলে বিশ্বাস করবে না। যাই হোক, কলকাতার রাস্তায় হাতি এই অদ্ভুত দৃশ্যের চিহ্ন হিসেবে আমাদের কয়েকটা ছবি তুলে রাখার ইচ্ছে হ'ল। ঐরকম ভয় পেতে পেতেই চোখ কান বুজে পটাপট ছবিগুলো তুলে ফেলা গেল। একটা হাতির ছবিও আপনাদের পাঠালাম হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে। তবে এই ছবিটা অত কাছ থেকে তোলা না, এটা আমরা তুলেছিলাম হাতিকে একটু দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরে।

আমার নিজেরও প্রায় ন্যাদোশের মতো গরুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের বাড়ির সামনে সব সময়

সারিসারি গরু বসে থাকত। তাদের আমরা রোজ সন্ধ্যেবেলা পরিবেশন করে খাওয়াতাম, গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিতাম। এমন শিক্ষাও দিয়েছিলাম যে 'বোস্' বললে বসত। তার মধ্যে সব থেকে ভালোবাসার গরু ছিল কমলা।

তার ছিল ভারি মর্জি, কথা মত চলত না মোটেই। ছোটো থেকে শেখানোতে কোনোই ফল হয়নি। তবে ভারি ভালোবাসত আমাদের; আদর ক'রে চেটে দিত, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ির সামনেই ব'সে থাকত, 'এ্যাই' বলে ডাকলে, কাছে আসত। খেয়ালী ছিল ব'লে হঠাৎ হঠাৎ দৌড় লাগাত। গরুর খাবারের চেয়ে বেশি ভালবাসত, পাঁউরুটি, রসগোল্লা, আর অন্যান্য মিষ্টি কিংবা বিস্কুট। শেষটা এমন হল যে বড়রাও ভাল বেসেছিলেন তাকে। একদিন ওর কি করে জানি মুখ কেটে গিয়েছিল তাই বাবা ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। প্রথমে ও বুঝতে পারেনি তাই ওষুধ লাগাতে দিতে চাইছিল না। কিন্তু বুঝতে পেরে নিজেই গলা বাড়িয়ে দিত তারপর থেকে ওষুধ লাগাতে গেলে।

একদিন ও আমাদের বসার ঘরে ঢুকে পড়েছিল দরজা খোলা পেয়ে। ভুল বুঝে নিজেই বেরিয়ে গেছিল, তানাহ'লে মুস্কিল হত, কারণ ও তখন প্রমাণ সাইজের হ'য়ে গেছে।

তবে দুঃখের কথা এই যে আর আসে না ও। খাটালের লোকেদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা বলেছে ওকে কারা চুরি করে নিয়েছে। এসব ঘটনা একটুও বাড়িয়ে বলা না, বাড়ির লোকেরা আর গোটা পাড়া এর সাক্ষী আছে। তখন কাউকে আমাদের বাড়ি চেনাতে হ'লে 'গরু বসে থাকা' বাড়ি বললেই হত। কমলা চলে যাওয়ার পর থেকে আজকাল আর ওরা বড় একটা আসে না। এই সেদিন একটা বাছুর এসেছিল তাকে বাঁশি বাজিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম; এসমস্ত কথা কেউই বিশ্বাস করে না; এমন কি বন্ধুরা আমার মাথায় ছিটও বলতে ছাড়ে না। তবে আপনারা আশা করি ওরকম অবিশ্বাস করবেন না।

আমাদের পোল্যাণ্ড বেড়ানো

শুভায়ু মুখোপাধ্যায়—৯২০/৮ বছর

গত বছর আমরা—মা, বাবা, মিষ্টুদিদি ও আমি বিদেশে গিয়েছিলাম। বিরাট বোয়িং প্লেনে চড়ে প্যারিসে গেলাম, সেখানে অনেক কিছু দেখলাম। কদিন থেকে পোল্যাণ্ড রওনা হলাম। রাতটা কাটালাম। একজন ফরাসী ভদ্রলোক ও মহিলা আমাদের কামরায় ছিলেন। পরদিন বিকেলে ওয়ারস শহরে পৌঁছলাম। একজন পোলিশ ভদ্রমহিলা আমাদের নিতে স্টেশনে এলেন।

ট্যাক্সি করে বিরাট এক হোটেলে (Hotel Forum) আমাদের নিয়ে গেলেন। তের তলায় ভারী সুন্দর একটা ঘরে আমাদের থাকতে দিল। কাঁচের জানালা দিয়ে রাস্তা, গাড়ী ট্রাম, বাস অনেক বাড়িঘর দেখা যেত। অনেকগুলো লিফ্‌ট্ ছিল। আমি ওগুলোতে চড়ে উঠতাম নামতাম। খুব ভালো লাগত। সবচেয়ে মজা লাগত লিফটের সামনে একটা ইলেক্‌ট্রিক জুতো পালিশের মেশিন ছিল। সেটাতে পা দিয়ে যতবার উঠতাম নামতাম জুতো পালিশ করতাম। কোনো পয়সা লাগত না। একটা সুইচ টিপে দিলেই আপনি আপনি পালিশ হয়ে যেত। একতলায় বিরাট লাউঞ্জ ছিল। সেখানে আমরা বসতাম, টি. ভি. দেখতাম, গল্প করতাম পোস্টকার্ড বা অন্য উপহারের জিনিসের দোকানও ছিল। আমরা সন্ধ্যাবেলা হেঁটে একটা ক্যাফেটোরিয়ায় খাবার খেলাম। পরের দিন ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর (বাবার চেনা) ওঁর গাড়ীতে করে আমাদের বেড়াতে

নিয়ে গেলেন। কত কত ঘুরলাম। যুদ্ধের সময় নাকি শহরের অনেক বাড়িঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল। নতুন করে আবার বানিয়েছে। আমরা ভীস্টুলা নদী, পুরোনো শহরের মধ্যে অনেক বাগান, মাডাম কুরির বাড়ি আরও কত কি দেখলাম। নতুন শহর খুব চকচকে, অনেক সুন্দর দোকান, অফিস আছে। পরের দিন একটা বাস-এ চড়ে পোল্যাণ্ডের পুরোনো রাজপ্রাসাদ দেখতে ভিলানভীয় (Wilanow) গেলাম। বাসের টিকেট হোটেলে কিনে বাস-এ চড়ে নিজেরাই পাঞ্চ করলাম। কোন কণ্ডাক্টার নেই। রাজপ্রাসাদের ভেতরে দেখবার সময় টিকেট করে একরকম চটি পরে ঢুকতে হল। ফেরবার পথে একটা বিরাট বাগান দেখলাম নাম লেজিংকি (Lezienki)। তার পরদিন প্রফেসর ব্যাবিজ (Babiez) এসে আমাদের Polish Academy of Science-এ নিয়ে গেলেন। সামনে কোপার্নিকাসের মূর্তি ও ভেতরে অনেক সুন্দর জিনিস দেখলাম। তার পরে উনি আমাদের Old Polish Dishes নামে একটা দোকানে নিয়ে খাওয়ালেন। খুব ভালো খাবার দিলো সেখানে। আমি আবার একটু খেতে টেতে ভালোবাসি। তারপর আমাকে আর মিষ্টুকে একটা দোকানে নিয়ে পুতুল, মালা ও অন্যান্য উপহার কিনে দিলেন। পরের দিন পোলিশ এ্যাকাডেমিতে লাঞ্চের নেমন্তন্ন। ওখানে বসে মিষ্টু-দিদি ওর পোলিশ বন্ধু Danusia-র (পোল্যাণ্ডের অন্য একটা শহরে থাকে) সঙ্গে ট্রাঙ্ককল-এ অনেকক্ষণ কথা বললো।

একদিন Palace of Science & Culture (Palace Kulture Nauki)-র একত্রিশ তলার উপরে উঠে শহরের চারদিকে দেখলাম। তার পরের দিন আমরা ওয়ার্স থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্রুনো রওনা হলাম।

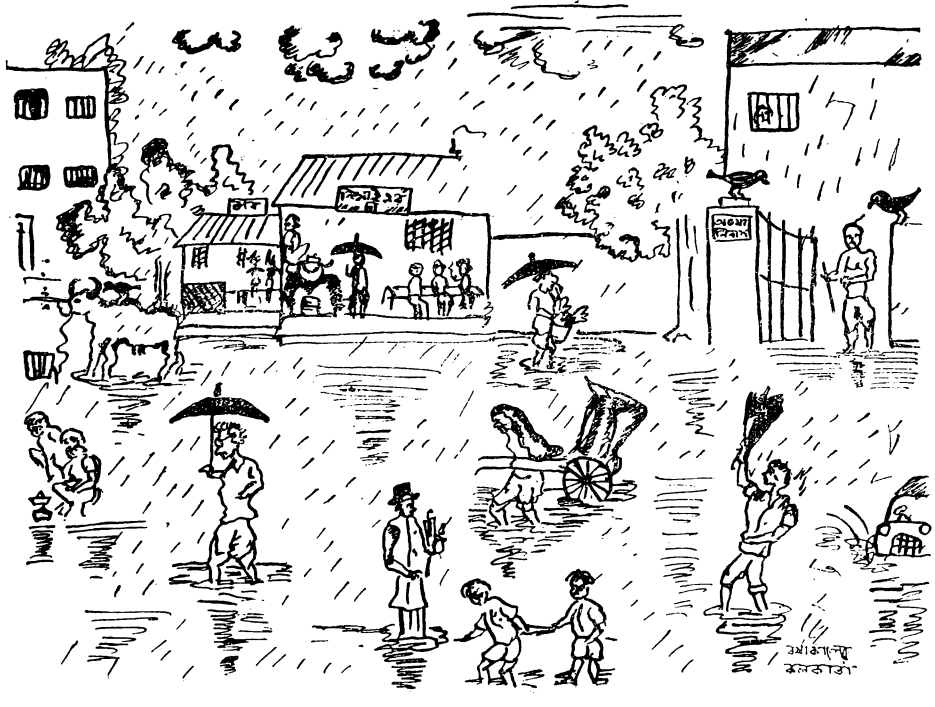

ইন্দ্রনীল
বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩২৩
১৪ বছর

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ

পথিক মণ্ডল—২০৪৫/১৬ বছর

রবীন্দ্রনাথ ছোট ছোট শিশুদের খুবই ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের অন্তরঙ্গ। এই নিয়ে তিনি নিজে বলেছেন—'বিধাতার নিজের হাতের তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না।...তাই চিরদিনই তারা ছোটদের সমবয়সী হ'য়ে থাকে... হিমালয়ের মতই তারা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরণাধারা কোন কিছুতেই তাদের শুকোয় না।...'

ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে ঘরের মধ্যে চাকর-বাকরদের তত্বাবধানে থাকতে হত, বাইরের মুক্ত আকাশ থেকে তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন। মুক্ত আকাশে পাখিদের বিচরণ করতে দেখে তাঁরও মুক্ত আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে হত। সেইজন্য তিনি বড় হ'য়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে ছোটবেলা থেকে প্রকৃতির কোলে গ'ড়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বোলপুরে শান্তিনিকেতন গ'ড়ে তুললেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় কত দুঃখ পেয়েছেন ইস্কুলে যাওয়া নিয়ে। সেইজন্য তিনি ছোটদের মনের মত একটা ইস্কুল তৈরি করলেন। তার নাম দিলেন—শান্তিনিকেতন।

তাঁর হাতে গড়া শান্তিনিকেতনে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থাকতো, তারা পেতো কবিগুরুর স্নেহ ভালবাসা। কিন্তু বাইরের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের জন্য যে তিনি কিছু ক'রতেন না তা' নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কবিগুরুকে দিত চিঠি আর তিনি তাদের সমবয়সীর মত চিঠির উত্তর দিতেন। একবার একটি ছোট মেয়ে তাঁকে লিখেছিল—'হে কবি! তোমার 'সহজ পাঠ' আমি পড়েছি, আমি বড় হলে তোমাকে শান্তিনিকেতনে দেখতে আসব।' এই চিঠি পেয়ে কবি খুশি হলেন এবং উত্তর দেবার আনন্দে তিনি কলম ধরলেন। তিনি লিখলেন—'আমার ছোট বন্ধুটি, তুমি যখন আমার সহজ পাঠ পড়েছ, তখনই তোমার সঙ্গে আমার জানাজানি হয়ে গেছে। তুমি বড় হলে আমায় দেখতে আসবে বলেছ। তা একটু তাড়াতাড়ি কর না বাপু।' এইভাবে কবি ছোট ছোট শিশুদের উৎসাহিত করবার জন্য সকল সময় চিঠির উত্তর দিতেন তাদের বন্ধুর মত।

ছোট ছোট বন্ধুদের জন্য তিনি লিখতেন কবিতা আর তা'তেই তাদের উৎসাহিত ক'রে তুলতেন। তিনি ছোট ছোট বন্ধুদের মনের কথা খুব ভাল করেই জানতেন। সেইজন্য কী করলে ছোট ছোট শিশুদের মন জয় করা যায়, সেটিও তিনি জানতেন। এই শিশুদের ভালবেসেই তিনি নিজের দেশকে ভালবেসেছিলেন।

সোমা দাশগুপ্ত
১৫৪১

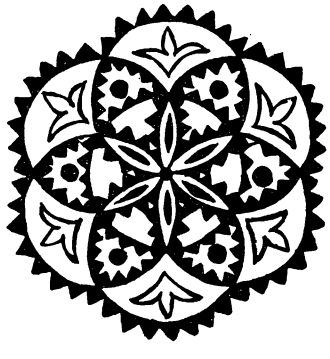

মধুছন্দা কয়াল—২৩৭১/১২ বছর

ছোট্ট গ্রাম

অতসি দেবরায়
২১৮৫/৭ বছর ৭ মাস

নীল আকাশের তলে,
নৌকা যে ভেসে চলে
ছোট্ট নদীর দুই ধারেতে
গাছ আর বাড়ি আছে।
গাছ থেকে পাতা পড়ে
টুপ্ টুপ্ টাপ্ করে।
তাই-না দেখে ছোট্ট মেয়ে
গান করে আর নাচে।

সমিত চৌধুরী—২১০৭

কার "জেনারেল নলেজ" বেশী? ঝন্টুর না মন্টুর?

চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১২ বছর

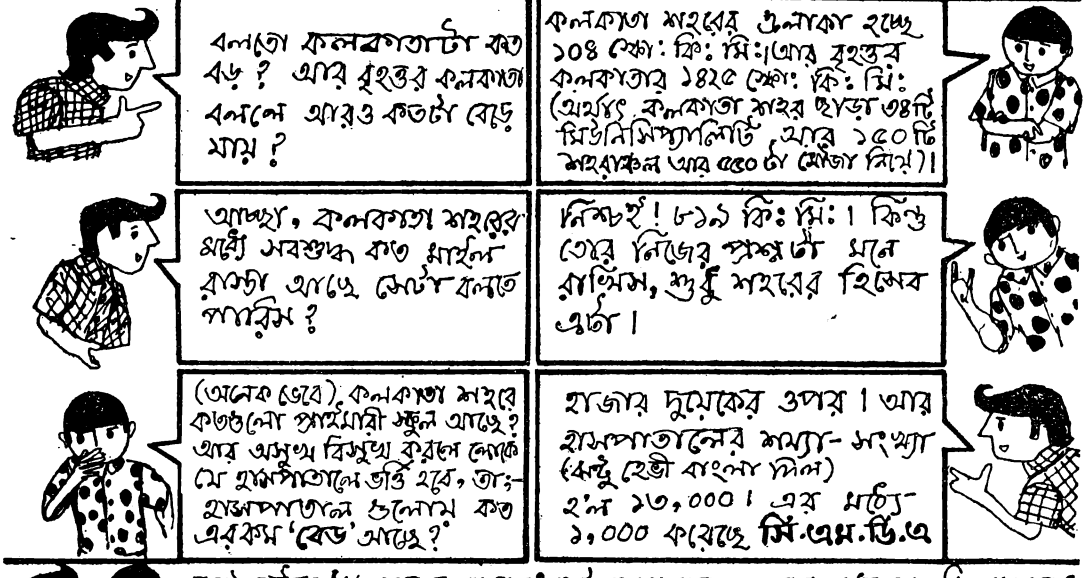

মামাবাড়ি

সরসিজ সেনগুপ্ত
১৩৭৮/১০ বছর

অনেকদিন ধরেই কথা ছিল গরমের ছুটিতে দিল্লী যাবার। টিকিটও কাটা হয়েছিল। আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছিলাম ছুটি হবে আর রওনা দেব। হঠাৎ যে কোথা দিয়ে কি হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। সেজদাদুর অসুখ করল আর আমাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তারপর যা হল সে এক বিশ্রী ব্যাপার, ছুটিতে সব বন্ধু চলে গেল বাইরে আর আমি একা পড়ে থাকলাম কলকাতায়। আর জানোই তো বাড়িতে থাকা মানে মা বাবা খালি বলবেন পড়াশুনো কর, পড়াশুনো কর, পড়াশুনো কর! ঠিক বলেছি কিনা? আর ওদিকে লোডসেডিংয়ের জন্য মার মেজাজ সব সময়েই তিরিক্ষে। নাঃ, এভাবে আর চলা যায় না। তাই ঠিক করলাম একটা কোথাও যেতে হবে। তাই মার কাছে ঘ্যান-ঘ্যানানি শুরু করলাম 'মা তুমি যে বলেছিলে রামরাজাতলায় মস্ত রামপুজো হয়, চলনা দেখতে যাব। তোমারও মামাবাড়ি বেড়ানো হবে আমারও মামাবাড়ি বেড়ানো হবে!' (মার মামা-বাড়িটা আমারও মামা বাড়ি তো)। মা খালি বাগড়া দেন, 'দাঁড়ানা, দেখনা, দেখছিস না বাসে কি ভিড়, আর এখন কি গরম পড়েছে?' কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা, 'যেতেই হবে, যাবোই যাব।' অবশেষে একদিন বেরিয়ে পড়লাম মাকে নিয়ে। প্রথমে পাঁচ নম্বর বাসে করে সোজা হাওড়া; তারপর সাবওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম হাওড়া বাস স্টপেজে। সেখান থেকে ফাঁকা দেখে একটা আটান্ন নম্বর বাসে উঠে জানলার ধারে ভাল করে বসলাম কিন্তু বসলে কি হবে স্টেশন ছাড়ার আগে বাসের যা চেহারা হল সে আর বলার নয়। লোকজনের চেঁচামেচিতে যদি বা বাস ছাড়ল তাতেও কি শান্তি আছে? একটু এগোয় আর একবার করে ব্রেক কষে। তার ফলে একজন আর একজনের গায়ে ঢিট্‌কে পড়ে। হঠাৎ পায়ের ওপর কোত্থেকে ঠাণ্ডা জল পড়ল, আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি সামনের এক বৃদ্ধা মহিলা গজ্‌গজ্‌ করছেন গঙ্গাজলের ঘটি উলটে গেছে বলে। এতক্ষণে বাইরে তাকালে দেখা যাচ্ছিল লোকের ভিড়, গাড়ি, বাজারে লোকেরা চেঁচাচ্ছে, কিন্তু এখন বাইরে তাকালে দেখা যাচ্ছে ছোট পুকুর, পুকুরের ধারে কুঁড়ে ঘর তার পাশে ছেলেমেয়েরা খেলছে ওদিকে দুচারজন কাপড় কাচছে কয়েকটা বাচ্চা কাঁদছে এইসব।

এরমধ্যে বাস কিছুটা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হল ভিড়ও খুব বেড়েছে আর কণ্ডাকটর যে কি রকম লোক ওর মধ্যে আবার আরো লোক চাপাচ্ছে! বাসটা যেন ইলাস্টিক, টানলে বড় হয়ে যাবে! যাইহোক বাসটা যখন রামরাজাতলার ছস্টপেজ আগে তখন হঠাৎ ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করে বাস বিগ্‌ড়ে গেল! ড্রাইভার তখন বাসের নিচে খুটুর খুটুর করছে আর কণ্ডাকটর বাস ঠেলছে দেখে আরো কয়েকজন লোক নেবে পড়ল বাস ঠেলতে। তাদের মধ্যে একজন বাস ঠেলতে ঠেলতে ফোড়ন কাটল 'বুঝলেন দাদা সারা জীবনটাই সৎকাজে ব্যয় করলাম।' কয়েকজন আবার ভীষণ গণ্ডগোল লাগাল 'পয়সা ফেরত দিন'। আর কয়েকজন ফাঁকা জানলার ধারে ব্যাজার মুখ করে বসে থাকল বাস ছাড়ার আশায়। কিছু লোক ফেলল বাজী 'বাস যদি চলে আমি আপনাকে কুড়ি টাকা দোব আর বাস যদি না চলে আপনি আমাকে কুড়ি টাকা দেবেন, ঠিক আছে?' কেউ বা কোলে চাদর বিছিয়ে তাস খেলতে লাগল। আমি তখন মনে মনে বলছিলাম 'যেমন কর্ম তেমন ফল! অত লোক ওঠানো কেন?' যাই হোক হঠাৎ বাসটা ঘড়াং ঘড়াং ঘ্রর করে উঠে আবার ঘ্যাঁও করে করে থেমে গেল! 'ঠেল ঠেল আবার ঠেল হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো,'

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়াং—না এবার আর থামল না ড্রাইভার উঠল কণ্ডাকটর উঠল বাস ছেড়ে দিল, তখন বাজে বিকেল চারটে। যখন রামরাজাতলায় পৌঁছলাম তখন বাজে বিকেল সাড়ে চারটে। আমরা বাস থেকে নেমে মামাবাড়ি যাবার জন্য রিক্সা ভাড়া করলাম। রিক্সা প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ণ বাজিয়ে পাঁচ মিনিটে বাড়ির সামনে এনে দিল। রিক্সা থেকে নেমে দেখি বাড়ি তালা মারা শুধু মালির ঘর খোলা। মালি বনভোজনকে জিজ্ঞেস করতে ও একগাল হেসে বললে 'ও বাবু আপুনারা, কিন্তু তেনারা তো ছুটিতে বারাণসী বেড়াতে যাইয়েছেন।' আমি ও মা ধুপ করে বাগানে বসে পড়লাম !!

পথ চলতি

সুজন কুমার দত্ত

৬৮৪/১৫½ বছর

কাঠফাটা রোদ্দুরে চলেছি একা
জানি নে কপালে মোর
কি আছে লেখা।
বুকটা যে জ্বলে যায়,
কি জানি সে কি আশায়—
চলেছি সকাল হতে
এই এত বেলা,
ভাল যে লাগে না আর
এই পথ চলা।
যেতে হবে আরো, আরো
অনেক দূরে,
ভিন্‌দেশী গান গায়
অচেনা সুরে ;
সেই সে সুরের দেশে
যেতে যে হবেই শেষে,
তাই এই পথ চলা,
তাই এই কথা বলা।
তোমাদের ভালবাসা
পাথেয় করি,
ইচ্ছাটি শুধু—
যেন চলতে পারি।

★

ছড়া

সুমন্ত্র বসু

২৪২৯/১০ বছর ৬ মাস

যদি যাও ইস্ফল,
খেতে হবে নিমফল।

যাও যদি চীনদেশে,
যেও তুমি ভিনবেশে।

যাবে নাকি লণ্ডন ?
কাঁসর বাজাতে হবে
ঠন্ ঠন্ ঠন্।

যাবে কোথা ? আগ্রা ?
পায়ে দিও নাগ্রা।

যাবে নাকি দমদম ?
খেতে হবে চমচম।

কোথাও যাবে নাকো ?
যাবে শুধু বাজারে ?
আমায় বকালে কেন
হাজারে হাজারে ?

ঝড়

সায়ন ভট্টাচার্য

২২৪০/১০ বছর

হল যে ধরণী উতলা আজিকে,
কাঁপিছে তমাল বন—
আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে
চমকি ওঠে গগন।

বিজলীর খেলা চলিছে আজিকে,
সুদূর সুনীল নভে—
বজ্র উঠিছে গরজি গরজি
গুরু-গম্ভীর রবে।

প্রবল ঝটিকা নেমে আসিতেছে
প্রলয়ের সাথে সাথে,
তাহারি সঙ্গে ঘোর বরিষণ
আজিকে গভীর রাতে।

জগতের চোখে ঘুম নাহি আজ
বিজলীর সাথে সাথে
ঝড় মিলাইল দিগন্ত কোণে,
নবীন তরুণ প্রাতে।

শর্মিলা স্মৃতি পুরস্কার

প্রতিযোগিতার ফলাফল

(কয়েকজনের লেখা প্রায় সমান ভাল হয়েছিল বলে পুরস্কারগুলি ভাগাভাগি করে দেওয়া হল)

ক-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার (৩০·০০)—১৩৭৮ সরসিজ সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় পুরস্কার (২০·০০)—২২০০ সায়ন ভট্টাচার্য

খ-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার (৩০·০০)—১১২২ অভিজিৎ চৌধুরী
দ্বিতীয় পুরস্কার (২০·০০)—১৩২৩ ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

তাছাড়া এদের লেখাও বেশ ভাল হয়েছিল—ক বিভাগ—২১৬৪ শিশির পাল, খ বিভাগ—২৯৫ শ্রেয়া দত্ত, ৫৫২ শিবাজী বসু, ৬৮৪ সুজনকুমার দত্ত ১০৩৬ উদয়ন মিত্র, ১৩৮১ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ১৬২৩ অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, ২৫১২ কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬১২ নিবেদিতা বসু।

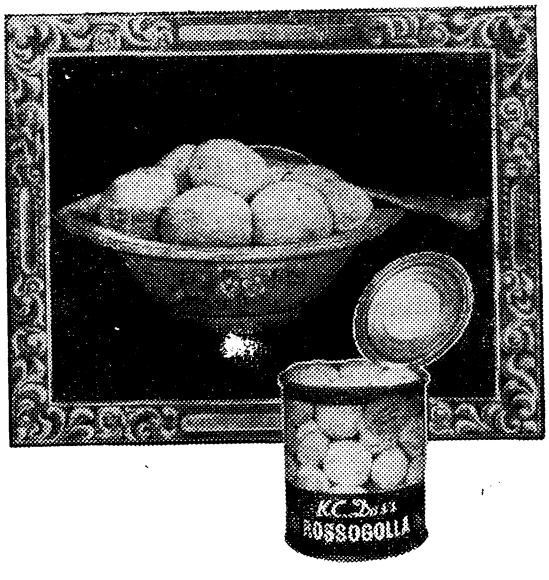

বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পে অবিস্মরণীয়
অবদান

রসগোল্লা

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত নবজাগরণে সমুদ্ভাসিত—সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি সকল বিভাগই মনীষিবৃন্দের আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল। সেই নবজাগরণের দিনে বাগবাজারে রসগোল্লার আবির্ভাব—স্বনামধন্য নবীনচন্দ্র দাশের উদ্ভাবনী শক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

বিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞানের মাধ্যমে কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ বায়ুশূন্য আধারে রসগোল্লা সংরক্ষণে সাফল্য লাভ করেছেন। এই অভূতপূর্ব প্রবর্তনায় আজ রসগোল্লা দেশে বিদেশে সুবহ ও সমাদৃত।

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা — ব্যাঙালোর

কিলিমাঞ্জারো

॥ গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

আমরা ঠিক করলাম পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে কিলিমাঞ্জারো পাহাড় চড়ব। ছেলেদেরই এতে বেশি উৎসাহ। চড়তে গেলে নানান সরঞ্জামের দরকার হয়। যেমন, শুকনো খাবার-দাবার, দুসাইজ বড় বুট, যাতে দুই তিন জোড়া গরম মোজা পরা যায় জুতোতে পা গলানোর আগে। হাল্কা, অথচ গরম ওভার কোট, কান-মাথা ঢাকা টুপি, দুজোড়া করে দস্তানা, ইত্যাদি। এ ছাড়া লাগে কুলি ও গাইড। আমরা খোঁজ করে জানলাম যে চারটি সংস্থা মারফৎ এ সব ব্যবস্থা হতে পারে। প্রথম দুটি একটু ব্যয়সাধ্য—দুটি হোটেলের মারফৎ। বেশি খরচ লাগে কারণ সঙ্গে একজন রান্নার লোক, বাসন-পত্র, এমন কি টেবিল ঢাকা ও কাঁটা-চামচও বয়ে নিয়ে যায় হোটেলের কুলি। সে দুটো যায়গা বাদ দিলে থাকে ওয়াই এম সি এ এবং সরকারী ব্যবস্থা। ওয়াই এম সি এর মাধ্যমে যেতে গেলে প্রায় ৫০ মাইল দূরে মোশীয় শহরে গিয়ে ব্যবস্থা করতে হয়। সরকারী ব্যবস্থার দপ্তর এই আরুশা শহরেই। সেইটাই সুবিধের বলে আমরা ঐ দপ্তরে গেলাম। তারা বেতার মারফৎ কিলিমাঞ্জারোর 'গেট'এ খবর পাঠাল। এই গেট হচ্ছে আসলে কিলিমাঞ্জারো ন্যাশনাল পার্কের দপ্তর। এখানে তাদের প্রধান ওয়ার্ডেনের দপ্তর আছে। তাছাড়া সেখান থেকে গাইড ও কুলি নেওয়া যায় এবং গরম কাপড়-জামা ভাড়া পাওয়া যায়। ঐ দপ্তরটি পাহাড়ের গায়ে প্রায় ছ'হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ঐ পর্যন্ত গাড়ি করে যাওয়া যায়—তারপর পদযাত্রা। আমরা তো সব ঠিকঠাক করে ফেললাম ২৫শে জুন রওনা হব। তারপর আমার অল্পস্বল্প ভয় ভয়ও করতে লাগল! ভারতবর্ষে পাকা রাস্তা বেয়ে দার্জিলিং বা সিমলাতে যা বেড়িয়েছি, তাকে পাহাড় চড়া বলে না। আর সেও খুব বেশি হলে ৮০০০ ফুট উঁচুতে। সেখানেও সিমলার শিখর জ্যাকো পাহাড়ে উঠতে বেশ হাঁপ ধরে। আর এখন পঞ্চাশের দিকে পা বাড়িয়ে এই পাহাড়ে চড়ার শখ করে শেষ পর্যন্ত কি অবস্থা হবে, তা একটু ভাবাচ্ছিল। কিন্তু একবার যখন স্থির করেছি, এবং তিন ছেলে এত উৎসাহিত, তখন আর অগ্রপশ্চাৎ ভেবে লাভ নেই। তবু একবার এখানকার এক ভাল ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলাম। ভদ্রলোক আমাদের যেতে অনুমতি দিলেন—তবে বললেন যে আমার স্ত্রী আরতি ও আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র সুমন্ত, যার বয়স বারো, যেন ১২ হাজার ফুটের বেশি না ওঠে, কারণ ওদের মাঝে মাঝে হাঁপানি হয় এবং বেশি উপরে উঠলে

হঠাৎ ফুসফুসে জল জমে যেতে পারে। কিলিমাঞ্জারোতে বারোহাজার তিনশ চল্লিশ ফুট উপরে দ্বিতীয় ক্যাম্প আছে। ঠিক হল ওরা সেখান পর্যন্ত যাবে এবং তারপর আমার আর দুই পুত্র, পৃথিরাজ (১৫) ও অমিতাভ (২১) আমার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। আমরা আঠেরো হাজার দু'শো চল্লিশ ফিট্ উপরে 'গিল্‌ম্যান্‌স্ পয়েণ্ট'ও ওঠার চেষ্টা করব।

এরপর শুরু হল এক সপ্তাহ ধরে রোজ ভোরে উঠে মাইল খানেক দৌড় ও পা' এর ব্যায়াম। প্রথমে বাঁ পা ও তারপর ডান পার ব্যায়াম।

এয় মধ্যে আমরা বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবকে টেলিফোন করে কিছু কিছু গরম কাপড় এবং বাড়তি কম্বল ও স্লিপিং ব্যাগ ধার করলাম, যাতে ভাড়া করার খরচ কমে। কারণ প্রতিটি ভাড়া করা সামগ্রীর খরচ দশ থেকে পঁচিশ টাকা। তার উপর আছে কুলি ও গাইড ভাড়া, খাবার খরচ, ক্যাম্পে রাত কাটানর ভাড়া ও পাহাড় চড়ার অনুমতি পত্রের ফী। তাই যতটা সম্ভব খরচ বাঁচিয়ে, প্রস্তুত হয়ে (এবং অল্প দুরুদুরু বুক নিয়ে—হাজার হলেও মনে মনে ভেতো বাঙ্গালী তো) ২৪শে জুন সকাল সকাল খেয়ে ঘুমতে গেলাম। এর মধ্যে বলা দরকার যে মনে সাহস সঞ্চয়ের ব্যাপারে দুজন বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব আমাকে বেশ প্রেরণা দেয়। এরা হল শ্রী মণ্ডল ও চক্রবর্তী। পশ্চিম বাংলা থেকে সাইকেল চড়ে এরা গত দুবছরে ভারতবর্ষ তো ঘুরেইছে। আপাতত উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকা ভ্রমণ করছে এবং সামনের বছর আমেরিকা যাবে। বয়স হবে কুড়ি বা একুশ। পাহাড়, জঙ্গল ও শহর, সব যায়গায় অচেনা লোক, না-জানা ভাষায় তারা কথা বলে এবং পকেটে খুবই কম টাকা। এই অবস্থায় হাসি মুখে, ফুর্তি করে এরা দুজন সাইকেল করে আরুশা এল এবং এক সন্ধ্যা বেলায় আমাদের বাড়িতে বসে রাজ্যের গল্প বলে আমাদের চমৎকৃত করে দিল। মনে মনে ভাবলাম, আমার বয়সের অর্ধেকের চেয়েও কম এদের বয়স—এরা যদি এরকম বেপরোয়া হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বেরতে পারে, তাহলে আমি যদি আমার পরিবারবর্গ নিয়ে পাঁচদিনের জন্যে কিলিমাঞ্জারো চড়তে যেতে না পারি, তো কোন মুখে শিক্ষকতা করি—যার মূল উদ্দেশ্য হল উত্তরপুরুষকে বলিষ্ঠ কর্মী করে গড়ে তোলা ?

যাই হোক, ২৫শে জুন সকাল এসে গেল এবং আমরা ভোর পাঁচটায় উঠে, প্রাতরাশ সেরে, গাড়ি করে রওনা হলাম কিলিমাঞ্জারোর পথে। পঞ্চাশ মাইল পূর্ব দিকে গেলে প্রথমে পড়ে মোশী শহর। আরুশার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট মতন আর মোশী প্রায় দুহাজার ফুট নিচে। পাকা রাস্তা। আরুশা ছাড়ার পর প্রথমটা দুধারে জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড় ও এখানে ওখানে গ্রাম ভুট্টা ক্ষেত ও কফি চাষের জমি। এই সব কফি প্লানটেশন এখনও গ্রীক, জার্মান ও ইংরেজদের হাতে। সরকার কিছু কিছু নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এদেশের লোকের মধ্যে এইসব অর্থকরী চাষবাসের উৎসাহ বেশ কম। কফি প্লানটেশন যা সরকার নিয়ে নিয়েছিলেন তার দু-একটি আবার এর মধ্যে তাঁরা বিদেশীদের ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন, কারণ ভাল ভাবে চালানোর অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ সহ কোনও লোক তাঁরা পাননি এ দেশে।

এই পথের ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে বলা যায় মেরু পাহাড়ের শাখাপ্রশাখা। মেরু পাহাড় আরুশার মাইল পঁচিশ উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে আছে। এর উচ্চতা পনেরো হাজার ফুটের চেয়ে অল্প কম। এই অঞ্চলের আর সব পাহাড়ের মতন, যেমন কিলিমাঞ্জারো, এও এক কালে ছিল আগ্নেয়গিরি। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে এক বিশাল অগ্নুৎপাতের সময় এর পূর্বদিকের গা ভেঙ্গে-চুরে লাভা ও গলা পাথর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ অগ্নুৎপাতের আগে পর্যন্ত মেরুর উচ্চতা কম করে আরও হাজার দশেক ফুট বেশি ছিল এই মেরু থাকার জন্যেই আরুশা অঞ্চলে আশপাশের যায়গার থেকে বেশি বৃষ্টি পড়ে এবং ফলে চারদিকের চাষবাসও ভাল হয় এবং জঙ্গলও প্রচুর। মেরুর চারদিকের জঙ্গলকে নিয়ে আরুশা ন্যাশনাল পার্ক করা হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে সরকার বেশ কয়েকটা রাস্তা তৈরি করেছেন। জঙ্গলের কাছে একটি ছোট হোটেলও আছে। আমরা

এই জঙ্গলে গাড়ি করে ঘুরে কত রকমের জন্তু ও পাখি দেখেছি, তার ঠিক নেই। সবচেয়ে অপূর্ব লেগেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ফ্লেমিংগো পাখি, যারা এই জঙ্গলের ঝিলে থাকে। এই মেরু পাহাড়েও চড়া যায়। আমার মেজ পুত্র পৃথিরাজ এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে একটি দলের সঙ্গে গিয়ে মেরুর চুড়োয় চড়েছিল। এতে চড়তে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার প্রচণ্ড দমের। মেরুর চুড়োর কাছটা ভস্ম-ভসে লাভার ছাইএ ভরতি। শেষ দুতিন ঘণ্টা একেবারে না থেমে, কতকটা কাঁকড়ার মতন কিছুটা পাশে হেঁটে এগিয়ে চলে এক নাগাড়ে চুড়োয় না পৌছুলে সেই ছেলেবেলার অঙ্কের বাঁদরের মতন হয়—তেল মাখানো বাঁশ বেয়ে খানিকটা ওঠা ও তারপরই পিছলে সড়সড় করে নেমে আসা!

মেরু চড়তে দু'দিন লাগে এবং দ্বিতীয় দিন একটানা ৯'ঘণ্টা চড়তে না পারলে ফিরে আসতে হয়, কারণ রাত্রি নামার আগে অনেকটা নিচে নেমে আসতে হয়। মেরুর উপর থাকার কোনও জায়গা নেই। সরকার একদা একটি ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন—কাঠের বাড়ি। কিন্তু ঐ পাহাড়ের মাসাই বাসিন্দারা বাড়িটি ভেঙ্গে সব কাঠ জ্বালানীর জন্যে নিয়ে গিয়েছিল।

এই মাসাইরা এখনও পুরোপুরিভাবে দেশ চেতনা মানে নি এবং উপজাতীয় স্বাধীনতা যতটা পারে বজায় রাখে। এদের আচার ব্যবহারও এরা আঁকড়ে আছে। যেমন কোনও পুরুষ বিয়ে করার আগে নিজেকে বীর বলে প্রমাণ না করতে পারলে মেয়েরা তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আগে যুবকরা বিয়ের আগে সিংহ মেরে আসত। এখনও আইন ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে সিংহ মারে। সিংহ মারতে না পারলে অন্ততঃ ছোটখাট একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে পাঁচ জনের সামনে। তারপর বিয়ের দিন একটি লাঠি হাতে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সামনে আধঘণ্টা ধরে জোড়া পায়ে বহু উঁচু লাফ দিয়ে নিজের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হয়। এত করেও তার বিয়ে সম্পন্ন হয় না। শেষ মুহূর্তে হবু স্ত্রী প্রাণপণে দৌড় লাগায় এবং মাসাই যুবক তাকে তাড়া করে ধরতে না পারলে, তার কপালে সে যাত্রা আর বৌ জোটে না। এরা এই শরীর চর্চা নিয়ে এত মাথা ঘামায় যে তার ফলে এদের খাবার দাবারও একটু বিশেষ ধরণের।

একটাই উদাহরণ এখানে দিই। এরা গরুর রক্ত কাঁচা খায়। গরুর গলার শিরায় ছোট্ট একটা ফুটো করে শরকাঠি দিয়ে রক্ত বের করে নেয়। মেয়েরা এই রক্ত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খায়। পুরুষরা এই রক্ত তাজা সরাসরি খেয়ে নেয়। এই রক্ত খাওয়ার চল শুধু গ্রামবাসী মাসাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শহুরে মাসাই, কোম্পানীর ম্যানেজার, এমন দু'একজনও বলেছেন যে তাঁরা এখনও মাঝে মাঝে গরুর রক্ত খান—শরীরকে তাজা রাখবার জন্যে।

যাই হোক, আবার কিলিমাঞ্জারোর পথে চলা যাক। আরুশা থেকে মাইল কুড়ি যাওয়ার পর মেরু ও তার শাখা পাহাড় ছাড়িয়ে মোটামুটি সমতল জমিতে নামতে হয়। এখানে বৃষ্টি বড়ই কম এবং বিষুবরেখার মাত্র পাঁচ ডিগ্রী দক্ষিণে প্রচণ্ড রোদের তাপে ছোট কাঁটা ঝোপ ছাড়া বিশেষ কিছুই গজায় না। বেশির ভাগ লোকই গো-পালন করে এবং কাঁটা ঝোপের সামান্য পাতা খাওয়া সব গরুরই বেশ রুগ্ন চেহারা।

এই ধু-ধু করা তেপান্তরের মাঠ ভেদ করে পাকা রাস্তা দিয়ে মোশীতে পৌঁছনর পর আবার জঙ্গলের শুরু হয়, কারণ এবার কিলিমাঞ্জারোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে মেঘরা বৃষ্টিপাত করে এ অঞ্চলে। মোশীর পাশ কাটিয়ে আরও তিরিশ মাইল উত্তর দিকে গেলে মারাঙ্গু বলে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। এই গ্রামেরই প্রান্ত থেকে কিলিমাঞ্জারো চড়া শুরু।

এই অঞ্চলের উপজাতির নাম হল চাগা। এরা পাহাড়ে মানুষ। খুব হাসিখুশি এবং বেশ কর্মপটু। মাসাইরা যেমন গোচারণ ও বড় জোর ভুট্টা ফলানোর বেশি আর কিছু করতে চায় না, চাগারা তেমনি অর্থ উপার্জনের নতুন কিছু কলা শিখতে পারলে খুব মন দিয়ে কাজ করে। ফলে এরা বেশ অবস্থাপন্ন। মাসাইরা এদের বোধ করি একটু হিংসেই করে। কারণ চাগারা

কেমন, একথা মাসাইদের জিজ্ঞাসা করলে তারা এক বাক্যে বলে যে ওরা চোর ও ফন্দিবাজ। আমাদের দু-চার জন চাগা বন্ধু ও পরিচিত যারা আরুশাতে আছেন, তাদের মধ্যে আমরা অপ্রশংসনীয় কিছুই দেখিনি। বরঞ্চ দেখেছি তাঁরা কর্মঠ এবং তাঁদের বাড়ি ও বাগান সুন্দর ভাবে সাজানো। এই চাগারাই কিলিমাঞ্জারো চড়ার সময় কুলি ও গাইডের কাজ করেন।

আমরা মারাঙ্গু গ্রাম পেরিয়ে কিলিমাঞ্জারোর গা বেয়ে প্রায় হাজার তিনেক ফুট উঠে "গেটে" এ পৌঁছলাম। এখানে আমাদের জন্যে দুজন গাইড ও ছ'জন কুলি অপেক্ষা করছিল। পাঁচজন আমাদের মালপত্র নেবে ও একজন নিজেদের মাল ও খাবার দাবার নেবে। গেট অফিসে নানান রকমের ফর্ম ভরতি করে, টাকা দিয়ে আমরা দশটা নাগাদ যাওয়ার আজ্ঞা পেলাম। কিন্তু গাইডদের তখনও খাবার দেয়া হয়নি। অতএব একজন গাইড ও পাঁচজন কুলি নিয়ে আরতি ও ছেলেরা রওনা হয়ে গেল। অন্য গাইডকে নিয়ে আমি আবার মারাঙ্গু গেলাম ওদের খাবার কিনতে। সব কিনে বেটে আমার রওনা হতে বেলা ১১ টা বাজল। দুজন গাইডই হাসি-খুশি লোক। তার একজন বিশেষ ইংরেজী জানে না। তার নাম ক্রিষ্টোফার ম্রঙ্গ। অন্য জন রওয়াইচ জন। এ বেশ ইংরেজীতে রপ্ত, তবে—এই তবেটা তখন জানলে ভাল হত। জানলাম যখন, তখন আর কিছু করার নেই।

জন, আমাকে বলল যে পথে যথেষ্ট জল পাওয়া যায়, অতএব আমাদের জলের পাত্রগুলি গাড়িতে রেখে যাওয়াই ভাল। তার কথামত জলের পাত্র গাড়িতে রেখে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম দিন আট মাইল পথ পাহাড়ে চড়তে হয় —ছ'হাজার ফুট থেকে ন'হাজারে ওঠা। পাৎলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া যাতে অল্প অল্প করে অভ্যাস হয়, তার জন্যেই প্রথম দিন ন'হাজার ফুটের বেশি ওঠা বারণ।

পথটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। নানান জাতের গাছ, তার মধ্যে বেশির ভাগই পাইন জাতীয়। এখানে প্রায় রোজই বৃষ্টি হয়। ফলে সব বড় গাছে গাছে পর-গাছা গজিয়ে লম্বা দাড়ীর মতন চারদিকে ঝুলছে। আমরা একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে বাকিদের দেড় ঘণ্টা পরে ধরে ফেললাম। সেখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে জন, আমাদের পাঁচ জনের জন্যে আমার ছুরি ধার করে পাঁচটা সোজা সোজা গাছের ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে দিল। পাহাড় চড়া ও নামার সময় এই লাঠির খুব দরকার। আমরা তারপর লাঠি নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম।

যতই এগোই, পথ ততই খাড়া হয়। এর মধ্যে বৃষ্টি নামল। আমরা সাড়ে চার ঘণ্টা পাহাড় চড়ে যখন প্রথম ক্যাম্পে পৌঁছলাম, তখন গায়ের পুলোভার ও পায়ের মোজা জুতো চপচপে ভেজা। এই পথটা আমরা বুট পরে হাঁটিনি, ক্যাম্বিসের জুতো পরে এসেছিলাম।

এই প্রথম আস্তানার নাম মাণ্ডারা। নামটি নেওয়া হয়েছে চাগাদের এক নেতার বংশগত নাম থেকে। এখানে খান দশেক কাঠের দোচালা আছে। এই দোচালাগুলি নরওয়ে দেশের পাহাড়ী অঞ্চলের যাত্রীদের থাকার "কেবিনের" অনুকরণে তৈরি। চারদিকে কাঠের দেওয়াল দেওয়া লম্বা একটি ঘরকে মাঝখান থেকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে দুভাগ করা। প্রত্যেক ভাগে চারটি করে দেওয়ালে লাগানো শোয়ার জায়গা এবং প্রত্যেকটি শোয়ার জায়গাতে একটি করে রবারের তোষক—ডানলো-পিলো জাতীয়। এ-ছাড়া ঘরের মাঝখানে ছাতে আটকান আলনা এবং দুটি ছোট তাক।

এই রকম এক একটি ঘরের আয়তন খুবই ক্ষুদ্র। চারজন লোক কোনও ক্রমে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। আমরা এইরকম একটি তাঁবু বাড়ি দখল করলাম—অর্থাৎ ছ'জনের শোয়ার জায়গা। পাঁচটিতে শোওয়া ও বাকি দুটিতে জিনিসপাতি রাখা। এইরকম ছোট ছোট তাঁবু ছাড়া আর একটি বড়সড় কাঠের বাড়িও আছে। সেটা খাবার ঘর। সেখানে আছে খান পাঁচেক কাঠের টেবিল ও তাদের দুধারে বেঞ্চি। আর সেখানে, একটি লোভনীয় জিনিস আছে—সেটা হল একটা বড় চুল্লি।

আমরা পৌঁছে, মোজা-জুতো ও পুলওভার বদলে ফেললাম। একেবারে বদলে ফেললাম বলা অবশ্য একটু ভুল, কারণ বাকিরা বদলালেও পৃথিরাজ ও আমি

জুতো-মোজা ছেড়ে, শুকনো মোজা পরে কম্বলে পা ঢুকিয়ে ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম, কারণ সব কুলি তখনও আসে নি। যারা এসেছে, তাদের বস্তা থেকে বেরল পৃথিরাজ ও আমার দুজনেরই ডানপাটির বুট। যে দুজন তখনও আসেনি, তাদেরই কারুর বস্তায় আছে দুখানা বাঁপাটি বুট! সেই কুলি আবার পর আমরা জুতো পরে একটু খবরদারি করলাম যাতে কুলিরা আমাদের ভিজে মোজা, জুতো ও কাপড় ঠিকমত শুকোয়।

ইতিমধ্যে গাইড এসে আমাদের রসদ নিয়ে গিয়ে খাবার করে আনল। খাবার আমরা রোজকার জন্যে মোটামুটি এক ধরণেরই নিয়েছিলাম—প্যাকেটের সুপ, টিনের মাংস ও রুটি দুপুর ও রাত্রের জন্যে। চা বা কফি, টিনের দুধ, মধু, চিনি, ডিম সিদ্ধ ও রুটি সকাল বিকেলের জন্যে।

সবাই বলে দিয়েছিল পাহাড়ে চড়ার সময় বিশেষ ক্ষিদে হয় না, অথচ শরীরে বল রাখার জন্যে পুষ্টিকর কিছু খাবার খেতে হয়। অতএব এর সঙ্গে পথে চলতে চলতে খাবার জন্যে আনা হয়েছিল বাড়িতে তৈরি নারকেলের বিস্কুট, কাজু বাদাম, কিসমিস, কমলালেবু ও প্রচুর চকোলেট। অনেকে আবার বলেছিলেন যে খুব গলা শুকিয়ে যায়, অতএব প্রচুর লজেঞ্জুস সঙ্গে নিতে। তাও আমরা নিয়েছিলাম। তবে পাহাড়ে খানিকটা চড়ার পরই আমাদের সকলের মুখ এত বিস্বাদ হয়ে গেল যে কেউই লজেঞ্জুস খাই নি। কুলিরাই পাঁচদিনে প্রায় শ'দুই লজেঞ্জস খেয়ে ফেলছিল। তাছাড়া অবশ্য তারা লুকিয়ে লুকিয়ে বেশির ভাগ কাজু ও বেশ কিছু চকোলেটও আত্মসাৎ করেছিল। তাই নিয়ে আর আমরা ওদের কিছু বলিনি।

সে রাত্রে আমরা আটটার মধ্যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আট মাইল অনবরত উর্ধ্বগামে হাঁটা ও সারা দিন ঐ ঠাণ্ডায় ভিজে গায়ে, ভিজে পায়ে থাকার পর চটপট করে স্লিপিং ব্যাগে ঢোকার আকর্ষণ মারাত্মক। আর শুয়েই এক মিনিটের মধ্যে আমরা পাঁচজন ঘুমিয়ে কাদা।

পরের দিন, ২৬শে জুন, সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেও বৃষ্টি নেই। পরে জানলাম ঐ অঞ্চলে, অর্থাৎ সাত থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে, রোজই দুপুরের পর বৃষ্টি হয়। আমরা প্রাতরাশ সেরে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন পাহাড়ে উঠতে হবে এগারো মাইল এবং তার মধ্যে প্রথম হাজার ফুট খুবই আস্তে। তার প্রধান কারণ ঐ পাৎলা হাওয়াতে নিশ্বাস নেওয়া অভ্যাস করার জন্যে।

দ্বিতীয় কারণ অবশ্য অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথম এক ঘণ্টার পথ প্রায় সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠার মতন খাড়া পথ, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তার উপর আবার পিছল রাস্তা।

সাবধানে ধীরে ধীরে আমরা দশ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌছতেই এক নিমেষে দৃশ্য বদলে গেল। এর পরের সাত আট মাইল রাস্তা ছোট শিখরের উপর দিয়ে, যার মাঝে অনেকখানি প্রায় সমতল ভূমি। এখানে বড় গাছ প্রায় নেই বললেই চলে। চারদিকে কোমর পর্যন্ত উঁচু ঝোপ এবং তার বেশির ভাগই সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরা।

এইসব ফুল তুলে সাজালে শুকিয়ে যাওয়ার পরও বহু দিন জলজলে থাকে। এক বছর তো বটেই—কারণ আমাদের এক বন্ধু গত বছর ঐ রকম ফুল এনেছিলেন, এখনও তা দেখতে তাজা আছে, যদিও শুকিয়ে গেছে একদম। আমরা ফিরতি পথে অনেক ফুল তুলে এনেছিলাম। যাওয়ার সময় খাড়া পথের পরিশ্রমে ও নতুন দৃশ্য দেখার লোভে আর ফুল তুলতে থামি নি। এই ফুলে ভরা ঝোপের দেশে পৌছে সামনে তাকিয়ে দেখি কিলিমাঞ্জারোর দুই চুড়ো বরফের মুকুট পরে ঝলমল করছে রোদ্দুরে। একটি চুড়োর নাম মাওয়েঞ্জি ও অন্যটির নাম কিবো বা উহুরু। উহুরু মানে আবার সোয়াহিলি ভাষায় স্বাধীনতা।

গোটা পূর্ব আফ্রিকা জুড়ে এই সোয়াহিলি বা কিসোয়াহিলি ভাষার চল। এর পত্তন বোধ হয় বহু শতাব্দী আগে আরব বনিক ও সৈনিকদের আগমনের সময় থেকে। এই ভাষাটির ঘাঁটি সমুদ্রের বন্দর অঞ্চলে। যত মহাদেশের অভ্যন্তরে ঢোকা যায়, তত এর কদর কমে যায়। এর মধ্যে বহু আরবী কথা আছে। যেমন "তাফাজালি"।

আবার হিন্দি, বাংলা মেলান কথার শেষে অথবা ইংরিজী কথার শেষে "ই" বা "উ" জুড়ে বহু সোয়াহিলি কথা হয়েছে। মাসাইদের বেশির ভাগ কথা "ই" তে শেষ এবং বান্টু ভাষার বহু কথা "উ" তে শেষ। এই দুই ভাষার প্রভাবে সোয়াহিলির বহু কথা "ই" বা "উ" তে শেষ হয়। যেমন যথেষ্ট বলতে গেলে "বাসই" বললেই চলে। সুপ হচ্ছে "সুপু" গরুর মাংস হল "বিফু" এবং বই হল "কিতাবু"। মোটর গাড়িকে আবার "ঘারী" অথবা "মোতাকা" বলা হয় এবং আপিসের ম্যানেজারবাবু হলেন "ম্যানেজা"। এদিককার বেশির ভাগ লোকই—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—নিজের উপজাতির ভাষা ও সোয়াহিলি, দুইই জানেন। শিক্ষিতরা অবশ্যই ইংরিজীও শেখেন। সোয়াহিলিতে এইসব বিদেশী ভাষা ছাড়াও বান্টু ইত্যাদি ভাষার বহু কথা আছে। যথা "ন্দিও" মানে "হ্যাঁ" এবং "হাপানা" মানে "না"। আর "সিজুই" মানে "জানি না"। ওটা আমি চট করে শিখে নিয়েছিলাম। তাতে সুবিধে হয়েছিল। তার কারণ বলছি।

এদেশে বহুলোকের বাস যাঁদের পূর্বপুরুষ ভারত-থেকে এসেছিলেন। এঁদের ভারতীয় বলা যায় না দুটো কারণে। প্রথমতঃ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওঁরা ভারতের নাগরিকতা গ্রহণ করেন নি। স্বল্প সংখ্যায় এরা যে দেশে বাস, অর্থাৎ টানজানিয়া, কেনিয়া বা উগাণ্ডা লেখানকার নাগরিক হয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগই নিজেদের বৃটিশ বা পর্তুগীজ বলে বর্ণনা করেন যাঁদের পূর্বপুরুষরা গোয়া অঞ্চল থেকে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের পর্তুগীজ বলেন এবং বাকীরা নিজেদের বৃটিশ বলেন ও দরকারের সময় লেখেনও, যদিও না পর্তুগাল, না বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, এঁদের গ্রহণ করতে রাজি! এঁদের কৃষ্ণকায় চর্ম এবং শ্বেতকায় প্রাণ একটু হাস্যকর ও কিছুটা দুঃখজনক এক ব্যাপার। অবশ্য এঁরা নিজেদের কৃষ্ণকায় বলে বিশ্বাস করেন না। এঁদের মতে কেবল আফ্রিকানরাই কৃষ্ণকায়, এবং কিছুটা নিম্নস্তরের মানুষ। ভাবটা কতকটা কারুর বুকের উপর বসে দাড়ী ওপড়ানর মতন। এঁদের খুব দুঃখ যে সাদা চামড়ার লোকরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এই শ্রেণীর লোকেরা এদেশে 'এশিয়ান' বা 'বানিয়ানী' (বেনে'র অপভ্রংশ) বলে খ্যাত।

এরা বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে তিন-গুণ লাভ না করলে এঁদের মতে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে। তা এঁরা নিজেদের যাই ভাবুন না কেন, হাজার হলেও দুতিন পুরুষ পূর্ব আফ্রিকাতে মানুষ হওয়ার ফলে সকলেই ভালভাবেই সোয়াহিলি ভাষা জানেন। আর এদেশের আফ্রিকানরা চেহারা দেখে তো আর আসল ও নকল (এশিয়ান) ভারতীয়র তফাৎ করতে পারেন না। ফলে আমাদের মতন লোকেদের বহু সময়ই অসুবিধে হয়। আমার উদ্দেশ্যে ছুটেছে সোয়াহিলির তোড়, আর তার মুখে আমি কুটোর মতন ভেঙে যাওয়ার দাখিল। তখন সেই তোড়ে বাঁধ দেওয়ার জন্যে চটপট করে বলে ফেলি, 'সিজুই কিসোয়াহিলি' অর্থাৎ সোয়াহিলি জানি না। এই জন্যেই 'সিজুই' কথাটা শিখেছিলাম। এখন ঐ 'উহুরু' শব্দ থেকে বহু দূরে চলে এসেছি, আবার ফিরে যাওয়া যাক।

ঐ কিবোর শিখরে ওঠা আমাদের লক্ষ্য। কিবো'র সম্পূর্ণ উচ্চতা উনিশ হাজার ফুটের উপর এবং বরফে ঢাকা। তবে আঠারো হাজার ছশো চল্লিশ ফুট উপরে 'গিলম্যানস্ পয়েন্ট' বলে একটা যায়গায় পৌঁছলেই এরা ধরে নেন যে কিলিমাঞ্জারো চড়া হয়েছে, এবং এটা করলে একটা সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়। অন্য ছোট চুড়োটা, যার নাম মাওয়েঞ্জি, সেটাতে চড়তে গেলে লাগে সত্যি-কার দক্ষতা, কারণ বেশ কয়েক যায়গায় পাথরের ফাটলে লোহার শিক বা 'পিটন' গেঁথে, দড়ি বেঁধে উঠতে হয়। তার জন্যে লাগে বহুদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। আমাদের জানা শোনার মধ্যে ওর উপর চড়েছেন কেবল এক সুইস্ ভদ্রলোক। তাঁর নাম হান্স্ লকার। তিনি মোশী'র আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ভদ্রলোক শখ করে প্রত্যেক বছর বার চারেক কিবোতে চড়েন। এবছর প্রথম মাওয়েঞ্জিতে উঠলেন।

আমরা যখন ঘণ্টা খানেক খাড়াই উৎরাই ভেঙে কিছুটা সমতল ভূমিতে উঠে কিবো ও মাওয়েঞ্জির বরফ ঢাকা চুড়ো দেখলাম, তখন মনে খুব ফুর্তি হল। ভাবলাম

আজকের মতন কষ্ট করে পাহাড়ে চড়া শেষ হল। এবার বেশ বেড়াতে বেড়াতে দ্বিতীয় ক্যাম্পে পৌছে যাব। কিন্তু তারপর ঘণ্টা দুই হাঁটার পর এই ফুর্তির ভাবটা কমে এল তার কারণ, দেখতে খানিকটা সমতল হলেও, আসলে আমরা অল্প অল্প করে উপরে উঠছি। এই ভাবে যখন এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় পৌছলাম, তখন দেখি সামনে তিনটি ছোট শিখর। চড়াই ও উৎরাই তিনবার ভেঙে তবে পৌছুতে হবে বারোহাজারের একটু উঁচুতে দ্বিতীয় ক্যাম্পে।

এই তিনটে ছোট শিখর পেরবার আগে আমরা একটা ঝরণার ধারে বসে খাবার খেলাম ও প্রচুর জল খেলাম। এত উঁচুতে হাঁপাতে হাঁপাতে ওঠার সময় শরীর থেকে প্রচুর জল উপে যায় ও ঘন ঘন জল খেতে হয়। এদিকে আমাদের ইংরিজী জানা গাইড তো জলের বোতল সব রেখে এসেছে। ফলে আমরা প্রায় ঝরণার জলে মুখ থুবড়ে জল খেলাম। আর এই সময় থেকেই বুঝতে পারলাম যে ঐ গাইডটির মতিগতি বদলে যাচ্ছে। পরে ভালভাবে বুঝেছিলাম যে উচ্চতার প্রভাব ওর শরীরে পড়ে ন,—মনে পড়ে। ফলে ও কতকগুলো ব্যাপারে একটু উন্মাদের মতন ব্যবহার করে।

তার একটা হল যদিও প্রত্যেক ক্যাম্পে সতর্কবাণী দেওয়া আছে যে ইচ্ছে না করলেও বেশি করে জল খাওয়া উচিত—ঐ লোকটি ইচ্ছে করে জলের বোতল ফেলে যায়! কিন্তু তখন তো আর ফিরে গিয়ে জলের বোতল আনা যায় না। অগত্যা আমরা ঝরণার জল খেয়ে আবার পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম।

এবার পথ বেশ সরু হয়ে এল এবং ক্রমে নিশ্বাসের কষ্ট আরম্ভ হল। ফলে কিছুক্ষণ অন্তর জিরিয়ে আমরা অবশেষে রওনা হওয়ার সাড়ে সাত ঘণ্টা বাদে, এগারো মাইল পথ পেরিয়ে দ্বিতীয় ক্যাম্পে পৌছলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

আলো-পাখাই হোক বা রেফ্রিজারেটর, হীটার আর ইস্ত্রিই হোক এগুলি কাজে লাগাতে কতটুকুই বা পরিশ্রম ? কেবল একটুখানি সুইচ টেপা--ব্যস্।

সত্যি কথা বলতে কি আজকের দিনে বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলে না. বিদ্যুৎ কিন্তু শক্তির উৎস নয়, এ নিজেই এক ধরনের শক্তি।

বিদ্যুৎ তৈরি হয় কি ভাবে ? বিদ্যুৎ তৈরির জন্য লাগে কয়লা বা অন্য কোন জ্বালানী। সাধারণত অন্য কাজে খুব একটা লাগেনা এই রকম কয়লাই বিদ্যুৎ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ তৈরির অন্যতম যন্ত্র হ'ল জেনারেটর। বিদ্যুৎ কারখানা-গুলিতে চাউস্ চাউস্ জেনারেটর দিন রাত এই কাজে লাগছে। এই জেনারেটর চালাতে আছে টারবাইন। জল থেকে জ্বালানীর সাহায্যে যে বাষ্প তৈরি হয় তারই চাপে টারবাইন ঘোরে। আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে জলের স্রোতের চাপে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। বাষ্প বা জল ছাড়া গ্যাসের সাহায্যেও কোন কোন জায়গায় বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে।

পারমানবিক শক্তি : পারমানবিক বিদ্যুৎ কারখানাতেও ঐ একই উপায়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে এখানে কয়লা বা তেলের বদলে পারমানবিক শক্তি দিয়ে বাষ্প তৈরি হয়। এছাড়া আর একটা সুবিধা হ'ল এতে জ্বালানী লাগে খুবই কম। যেমন ধর ৭৫০ টন কয়লার কাজ এক চামচ ইউরেনিয়াম দিয়েই চলে যায়। ভারতে তারাপুর ও রাজস্থানে এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

সৌরশক্তি : সূর্য সমস্ত শক্তির উৎস। সূর্যকিরণ থেকেও বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। অনেক দেশে এভাবে বিদ্যুৎ তৈরি শুরু হয়ে গেছে।

বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণ : বিদ্যুৎ তৈরিতেই কাজ শেষ নয়। এবার একে পৌঁছে দিতে হবে ক্ষেতে খামারে, সবার ঘরে ঘরে আর কলে-কারখানায়। এই কাজের জন্যে আছে একটি বিরাট পরিবহন ব্যবস্থা। একাধিক লাইন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। এই ব্যবস্থারই চালু নাম গ্রিড (Grid)

বিতরণ : বিদ্যুৎ তৈরি হয় অনেক জোরালো ভোল্টে। আমাদের ঘরে ব্যবহারের জন্যে বা কলে-কারখানায় ব্যবহারের জন্যে এই জোরালো ভোল্টের বিদ্যুৎকে সাব-স্টেশনে প্রয়োজনমতো ১২০ থেকে ২২০ ভোল্ট বা ৪০০ থেকে ৪৪০ ভোল্টে নামিয়ে আনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎই সবচেয়ে বেশী বিদ্যুৎ তৈরি করে। ১৯৫৫ সালে পর্ষৎ মাত্র ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতো আর আজ সেখানে তৈরি হচ্ছে ৬৬২ মেগাওয়াটেরও বেশী। এছাড়া আমাদের এ রাজ্যে পর্ষৎ এই প্রথম দশ হাজারেরও বেশী গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। এতে গ্রামে কলকারখানা এবং চাষবাসের অনেক সুবিধা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB 338/78

স্মৃতিসৌধ ॥ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ

তোমরা অনেকেই চাঁদের আলোয় তাজমহলের বাইরেটা দেখে এসেছ। কেমন ক'রে তাজমহল তৈরি হল সেই নিয়ে একটা গল্প আছে সেটা তোমাদের বলি।

মমতাজ বেগমের আসল নাম ছিল আরজুমান্দ বানু। সে শুধু গরীব ঘরের সুন্দরী মেয়ে নয়, খুব ভাল মেয়ে ছিল। প্রতিবেশী সহিদুল ছয় বছরের ছেলে, তাদের বাড়ি খেলা করতে আসত। তার খেলা ছিল ছবি আঁকা। ফুল পাতা পাখি এইসব। তখন কচি মেয়ে আরজুমান্দ হামা দিয়ে এসে কালির দোয়াত উল্টে কলম মুখে পুরে চিবোয়। সহিদুল দেখতে পেয়ে ছুটে এসে কলম কেড়ে নিয়ে দেখে তার কত যত্নের আঁকা ফুল পাখি কালি ধেবড়ে গেছে। সে রেগে জ্ঞান হারিয়ে আরজুমান্দের মাথায় চড় মারে। চড়ের আঘাতে মুখ থুবড়ে কচি দাঁত ভেঙে, শিশুর গোলাপী ঠোঁটের উপর লাল রক্ত গড়িয়ে আসে। এতে সবাই বকুনি দিল সহিদুলকে। এক দুর্ধর্ষ মেয়ে তার আঁকা কবুতরের চোখ কানা করে দিল অথচ বকুনী খেল সে? এ ভারি অন্যায়!

কান্না থামিয়ে আরজুমান্দকে ঘুম পাড়িয়ে তার মা রান্না ঘরে যান। সহিদুলের রাগ তখনও পড়েনি। কেমন করে পড়বে বল! তার এত সাধের আঁকা কবুতরের গোল লালচে চোখ কানা করে দিয়েছে দুষ্টুটা। দোয়াতের বাকী কালি ঘুমন্ত মেয়েটার মুখে ঢেলে তাকে শাস্তি দিতে গেল সহিদুল। দোয়াতে ছিল না একফোঁটা কালি। উপুড় করতে ঘুমন্ত মেয়েটার মুখে রঙিন হাসি ফুটে উঠল—ঠিক যেন সহিদুলের বোকামির উত্তরে এ হাসি। এতদিন যা দেখেনি বিস্ময়কর চোখে সহিদুল দেখল ঘুমন্ত মেয়েটার রেশমী চুল, শ্বেত পাথরের মত মসৃণ কপাল, ভ্রমরের ডানার মত দুটি ভুরু, ঝালরের মত চোখের পাতা। কোথায় লাগে এর কাছে কবুতরের মুখ।

দু বছরের আরজুমান্দকে দেখে ঘরের কোনে বসে সহিদুল তার চোখ-মুখ আঁকার চেষ্টা করে। সে কাগজের উপর মন নিবিষ্ট করলে মেয়েটা উঠে পালায় কিম্বা দেখতে আসে কাগজে কি হচ্ছে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে সহিদুলের শিল্প চর্চা। তার প্রতিজ্ঞা, আরজু-

মান্দের ফুলের মত মুখখানা সে আঁকবেই।

চার বছরের আরজুমান্দকে কাঁধে বসিয়ে সহিদুল অনেক দূরে চলে যেত। তাকে নির্জন ফুল বাগানের শেষ প্রান্তে একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়ে সহিদুল তার ছবি আঁকার সরঞ্জাম ছড়িয়ে বসত। এমনি অনেক দিনের চেষ্টায় আরজুমান্দের পুরো মুখ আঁকতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছিল।

সাত বছরের আরজুমান্দ বাগানে ছুটোছুটি খেলে। সব সময় স্থির হয়ে বসা পছন্দ নয়।

একদিন বুড়ো দাউদ আরজুমান্দের মাকে উপদেশ দিলেন। 'মেয়ের পায়ে শিকল পরিয়ে রাখিস। দিন দিন আসমানের পরী হয়ে উঠছে। কোনদিন দুখানা ডানা গজিয়ে আসমানে উড়ে না যায়।' একথা শুনে মেয়ে ছুটে এসে সহিদুলের কোমর জড়িয়ে বলল 'বুড়ো দাউদ বলেছে আমার ডানা হবে। আমি পাখির মত উড়ে যাব। তোমার দুখানা ডানা ক'রে নিও। দুজনে একসঙ্গে উড়ে যাব।'

সহিদুল নিজের আঁকা ছবি অপরকে দিয়ে পরখ করাতে গেল। পাড়ার সকলে চিনতে পারল এ আরজুমান্দের মুখ। বলে 'বেশ ভাল আঁকা হয়েছে।' ছবিখানা আরজুমান্দকে দেখালে সে চিনতে পারল না। বলে 'এ কোন দেশের মেয়ে? এখানে তো দেখিনি।' এ কথায় সহিদুল বার বার ছবিখানা দেখতে লাগল। তার মনে হল এ একখানা নিখুঁত নির্ভীক প্রতিকৃতি। কিন্তু চোখে মুখে জ্যান্ত মানুষের সাড়া কই? যা ফোটাতে পারেনি রেখার টানে কেমন করে তাকে চিনবে আরজুমান্দ। ছিঁড়ে ফেলল ছবিখানা। আবার আঁকবে প্রাণবন্ত একখানা।

বসন্ত আসে যায় আবার আসে। ওরা প্রতিটি ঋতুর সঙ্গে পরিচিত হয়। দুজনে প্রতিদিন বাগানে বেড়ায়, গল্প করে, ছবি আঁকার খেলা হয়। সেখানে একদিন পূর্ণ অবয়ব আরজুমান্দকে রেখার টানে ফুটিয়ে তোলে। এক সাধনায় সফল হ'লে অন্য ভঙ্গিমায় আর একটি সুরু করে। এমনি প্রতি বছরের এক একখানা ছবি—ত্রয়োদশী চতুর্দশী। এবার পঞ্চদশী আরজুমান্দের ছবি সুরু হয়েছে। কবে শেষ হবে তার ঠিকানা নেই। একদিন ছবি আঁকতে বসে আরজুমান্দ ছট্‌ফট করে। রেগে সহিদুল তার মাথায় চাপড় মারতে গিয়ে থমকে ফিরে আসে। ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে। কেউ কাউকে কোনদিন আঘাত দেয়নি জ্ঞান হওয়া অবধি।

ফতিমা বুড়ি এসে আরজুমান্দের মাকে সাবধান করে। 'তোর মেয়ে বড় সুন্দরী। এ রত্ন বিপদ আপদ থেকে খুব সাবধানে বাঁচিয়ে রাখিস।' এ কথায় ভীতা জননী মনে মনে ভাবে সহিদুল তার একমাত্র ভরসা। সেই পাহারা দেবে। আপদে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে। সহিদুল বড় সৎ ছেলে।

প্রতি বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে সম্রাটের প্রমীলা উদ্যানে মেলা হয়। সে মেলায় দেশ-বিদেশের সকল রূপসীদের ঢালাও নিমন্ত্রণ। সে মেলায় কোন পুরুষ মানুষ যেতে পায় না। বেগম ও শতশত অল্প বয়সী বাঁদীর সঙ্গে একমাত্র পুরুষ সম্রাট সাজাহান এ উৎসবে যোগ দেন।

প্রমীলা-উদ্যানে যাবার বয়স হ'য়েছে আরজুমান্দের। তার বেগম দেখার ভারি সখ। সে গেল। সেখানে রূপসীদের মূল্যবান আভরণ হীরে-মনি-মানিক্যের ছটায় চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে ওঠে। সে দূরে দাঁড়িয়ে বেগমদের দেখছিল। সম্রাট সাজাহান তাকে দেখে ফেলেন। সম্রাটের দুই বাঁদী এসে তাকে অভিবাদন জানিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আরজুমান্দ বলে—'আমার কোন মহৎ পরিচয় নেই। আমি এক দুখিনী ক্রীতদাসী কন্যা।' আরজুমান্দ ভাবল তার মত গরীবের প্রমীলা-উদ্যানে আসার অপরাধে হয়ত তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই কথা ভেবে তার চোখে জল আসতেই সে পালিয়ে গেল।

সম্রাট সাজাহান আরজুমান্দ বানুকে তাঁর বেগম করতে চাইলেন। মুক্ত আরজুমান্দকে আজীবন হারেম কারাবাসে থাকতে হবে। সহিদুল সম্রাট সাজাহানের পাঠানো রুপোর পাল্কীতে আরজুমান্দকে হাসিমুখে তুলে দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

সাজাহান হৃদয়বান রাজা ছিলেন। তিনি আরজু-মান্দের রূপে গুণে খুশি হয়ে তাকে প্রধানা বেগমের মর্যাদা দিলেন। নাম রাখলেন—মমতাজ। সেই মমতাজ মারা গেলে সাজাহান মমতাজের স্মৃতিকে অমর ক'রে রাখতে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ মনস্থ করলেন। দেশ বিদেশের সকল শিল্পীকে ডাকা হ'ল। যার তাজমহলের নক্সা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে, তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেবেন সম্রাট। তুরস্ক, পারস্য, চীন, গ্রীক্ রোম প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক নক্সা এল।

যার নক্সা মনোনীত হয় সেই ভাগ্যবান শিল্পীকে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণের জন্য সম্রাটের দরবারে হাজির করা হল। শিল্পী উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে বলে—'জাঁহাপনা, আমি এখন অন্ধ। স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কি করব! ও টাকা স্মৃতি সৌধ নির্মাণে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। আমি অনেক বেশি প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছি।'

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন 'কি তোমার প্রত্যাশা?' শিল্পী বলল 'প্রস্তাবিত স্মৃতি সৌধের চত্বরের এক পাশে আমার বাসের জন্য একখানি চালাঘর ক'রে দেবেন। সেখানে জীবনের বাকি সব কটা দিন কাটিয়ে যাতে তাজমহল তৈরির কাজ শেষ ক'রে যেতে পারি।' বিস্মিত হয়ে শিল্পীকে বলেন 'তুমি অন্ধ, কেমন ক'রে নির্মাণ-কার্য পরিচালনা করবে?'

শিল্পীর বাসনা তাজমহলের প্রত্যেকটি পাথরে হাত বুলিয়ে তার গঠন শৈলী পরীক্ষা করে।

শিল্পীর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। বহু বৎসর তাজমহলের নির্মাণ কাজ চলেছিল। যে মমতাজ মাত্র সতেরো বৎসর সম্রাটের চোখের মনি হয়েছিল, সেই মমতাজ মারা গেলে তার স্মৃতি সৌধ নির্মাণ দেখতে দেখতে সাজাহানের চুলে পাক ধরল।

তাজমহল নির্মাণ-কাজ শেষ হলে শিল্পী চলে গেল। তার নাম ছিল সহিদুল।

তাজমহল দেখতে আরজুমান্দ বানুর মা বেঁচেছিলেন না। সহিদুলও চর্মচোখে দেখল না। একদিন কাঁদতে কাঁদতে সহিদুল ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে চোখের জল আর শুকোয়নি। তাতেই সে ক্রমশঃ হ'য়ে গিয়েছিল অন্ধ। অন্ধ হয়েও শিল্পী সহিদুল মরজগতে অমর ভালবাসার স্মৃতিসৌধ তাজমহল তৈরি ক'রে গেল।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মজুরী

মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি সমান পড়ছে টাপুর-টুপুর ;
রুপোর বরণ পুকুর দীঘি জলে উপুর চুপুর।
কাজ কিছু নেই হাতে, ছুটির বাজার তাতে ;
ছাপরখাটে শুতেই এল ঘুমেতে চোখ জুড়ি ;
হঠাৎ যেন কানে আমার কে দিল সুড়সুড়ি !
ইঁদুরটাকি ধেড়ে ? চমকে বলি, 'কেরে ?'
চোখ না খুলেই— দেয় সে পাছে কামড়ে হাতে তেড়ে।
সঙ্গে সঙ্গে পেলেম জবাব (গলাটি বেশ হেঁড়ে)
'দিন দুপুরে ঘুম ! তাইতো জাগালুম।'
তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে পাশে দু'পাটি দাঁত মেলে
হাসছে একটা তেধ্ধেড়েঙ্গা ক্যাব্‌লামার্কা ছেলে !
রেগে দিলেম তাড়া 'দূর হ' হতচ্ছাড়া !'
বললে সে 'সার বিষ্টি ভিজে কষ্ট বড়ই পাচ্ছি।
ঘুম ভাঙানোর মজুরীটা মিটিয়ে দিলেই যাচ্ছি।'
চোখের নেইকো পরদা ! 'ভারী যে আস্পর্ধা !'
ধমকে বলি 'হচ্ছে মনে চেনা চেনা মুখটা।
চাবকে তোকে বুঝিয়ে দে'ব ঘুম ভাঙানোর সুখটা।
ভালো চাস তো বেরো।' দেখ-দিকিন্ গেরো !
হাত পা ছেড়ে দড়াম ক'রে মেঝের উপর সটান
পড়ল শুয়ে—চোখটি বুজে হ'ল সে চিৎপটাং।

নূপুর গাঁয়ের ক্ষ্যাপার ছেলে নূপুরকে কেউ চেনো ?
দেশের লোকের হাড় জ্বালাতে দ্বিতীয় নেই হেন।
আমার সঙ্গে তার ছিল না কারবার ;
না ডাকতে সে করে বেড়ায় পরের উপকার যে
শুনেছিলাম, প্রমাণ তা'রি পেলেম আজি কার্যে।
জাগল মনে ভয় 'মিরগী রোগ তো নয় ?'
পরক্ষণেই তারস্বরে জু'ড়ল সে যা কান্না !
কানে আঙুল দিয়ে হ'ল ব'লতে, 'আর না, আর না !

থাম রে, বাবা, থাম, কী যেন তোর নাম।'
তড়াক করে উঠে বললে, 'নূপুর চন্দ্র মান্না।
দিস্তে দুয়েক খাস্তা লুচির বেশি কিছুই চান না।
মাংস আলুরদম, পান্তুয়া চমচম,
গলদাচিংড়ী, দিলেও পারেন ছোলার ডাল এক বাটি;
রাবড়িটি চাই হওয়া কিন্তু গোরুর দুধের খাঁটি।
না দেন তো ফের কাঁদি।' বদমাইসের আদি!
দাবীর ফর্দে ঘুরল মাথা, সামলে বলি 'বৎস,
পাঁচটি টাকা দিচ্ছি, খাওগে রাবড়ি, লুচি, মৎস্য।
এর বেশি নেই সাধ্য। এবার হব বাধ্য
অ্যালসেশিয়ান পুষতে দোরে, উপকারের চেষ্টা
ক'রতে এলে গায়ে পড়ে প্রাণ হারাবে শেষটা।'
মেঝের থেকে উঠে নোটটা কোঁচার খুঁটে
বেঁধে বললে নূপুরচন্দ্র 'যা দেন যৎসামান্য
নিতেই হচ্ছে রাখতে নেহাৎ ভদ্রলোকের মান্য।'

শচীন্দ্রনাথ দরিপা

কোন পাখি ?

আমি যে 'শিকারী' পাখি—
উল্টে দিলেই গাছে—
ফুল হয়ে ফুটে থাকি ॥

আমি 'ধার্মিক' পাখি—
উল্টে দিওনা তবু—
ফুল হয়ে ফুটে থাকি ॥

আমি সুন্দর পাখি—
ওল্টালে পশু হই—
তবুও গাছেই থাকি ॥

আমিও ছোট্ট পাখি—
ওল্টাও পাল্টাও—
যা ছিলাম তাই থাকি ॥

লেজ কাটলে

মোদের তিন অক্ষরী নাম
শেষ অক্ষর লেজ কেটে দেখ
কি হয় পরিণাম ॥

মজার কাণ্ড কারখানা
কোন জন্তু ? লেজ কাটলেই
হই যে চারখানা ॥

বলি মন দিয়ে শোন তুই—
কোন জন্তু ? লেজ কাটলেও
রই সেই জন্তুই ॥

আর কতই করি নাম
কোন জন্তু ? লেজ কাটলেই
মিলবে হরিনাম ॥

* উত্তর—৫৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

অজয় হোম

ইস্টবেঙ্গলের পুলিশকে সাত গোল দেবার পরদিন বাজারে আলু ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে বলল, 'ভাখছেন তো প্রথম খ্যালায় কীরকম নমুনাডা...'। বললাম, 'হ্যাঁ দেখলাম তারুণ্যে ভরপুর ইস্টবেঙ্গল দল। কিন্তু তারুণ্যই সব নয়, অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। সেই অভিজ্ঞতা কোথায় দু-একজনের ছাড়া! 'ভাখবেন, ভাখবেন, এবছরের খ্যালাডা।'

মাঠে সমর্থকদের গণ্ডগোল, সে বোধহয় কোনোদিনই যাবে না। পুরো সময় এজন্য খেলাও হয় না। স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে খেলার দিন সকালে গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ ক'গোল দেবে ইস্টবেঙ্গল? 'পাঁচ থেকে দশ। টিম খানা একখান হইছে।' বললাম, 'সবই তো বুঝছি। কিন্তু বড় দলকে উলটে দেবার কয়েকটি ছোটো দলও আছে। তারা কখন যে কী করে তার ঠিক নেই। বহু বড় দলকে এমনিভাবে ঘায়েল হতে দেখেছি। সুতরাং স্পোর্টিং ইউনিয়ন, জর্জ টেলিগ্রাফ ওয়াড়ি, এরিয়ান্স এরা কখন যে কি করে বসবে তা কেউ বলতে পারে না।'

পরদিন সকালে গৌরাঙ্গকে বলি, 'কি গৌরাঙ্গ কি হলো? পাঁচ থেকে দশ গোলের?' 'হ-হ জিতছি তো।' 'তা জিতেছ ঠিকই, এ কী জেতা? আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে তোমার তারুণ্যে ভরপুর দলটির উপর। স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে খেলায় আমার কিন্তু সন্তুষ্ট করতে পারে নি। মনে হয়েছে, ইস্টবেঙ্গল সে ইস্টবেঙ্গল নয়। এ অনেক নিচুমানের।'

আমার ভয়টা সত্য হল ওয়াড়ির বিরুদ্ধে খেলায়। তাজ্জব বনে গেলাম খেলার নমুনা দেখে। সত্যি, ওয়াড়ি খেলেছে অপূর্ব। প্রতিটি খেলোয়াড় মরণপণ খেলেছে। যাকে বলে ম্যান-টু ম্যান। ইস্টবেঙ্গল প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু গোল করতে পারে নি। ওয়াড়ির উত্তম চক্রবর্তীর চটপট শটটি হয়েছিল সুন্দর। সাধে মনে হল ইস্টবেঙ্গলের কোচ একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন, না হলে উলগাকে বদলাবার কোনো মানে হয় না। অভিজ্ঞ উলগার মাঠে থাকার একটা দাম আছে। সে নিজে গোল না করতে পারলেও, গোল করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অভিজ্ঞতার দাম তো আছেই।

কলকাতার লীগ খেলার জল গড়ানো এখনও অনেক বাকি। পরের দিন সকালে গৌরাঙ্গ বলেছিল, 'ভাত খাইতে গেলে কাপড়ে পরবেই।' ঠিক কথা, খেলতে গেলে সবসময়ই জেতা যায় না, হারতেও হয়।

ওদিকে বুয়েনাস এয়ার্স-এ চলেছে বিশ্বকাপের খেলা। তাই নিয়ে উত্তেজনা আমাদের কম নয়। জল্পনা-কল্পনা চলেছে সর্বত্র। আমি ভাবি, ভারতের কোনোদিন সে সৌভাগ্য কি হবে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার? এর জন্যে যেমন চাই ভারত সরকারের সদিচ্ছা, তেমনি চাই ফুটবল কর্মকর্তাদের দলাদলি ত্যাগ, আর প্রতিটি সম্ভাব্য খেলোয়াড়ের নিজের প্রস্তুতি। ওখানে গা বাঁচিয়ে আর্টের উপর খেলা যাবে না। তার জন্য চাই স্বাস্থ্য ও প্রচুর দম।

ভাবছি গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জারমানি কাপটিকে ঘরে তুলবে, না অন্য দাবীদার ইতালি, কে? দু'দলই

চায় তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জিততে। পেলেহীন ব্রাজিল হতাশ করেছে। আর্জেটিনাও কম যায় না। তারও বাসনা নিজের দেশে নিজের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ী হবার। সব নির্ভর করছে মেরিও কেমপেসের উপর। গতবারের রানার্স হল্যাণ্ড তেমন জুতসই খেলতে পারছে না। হয়তো ওদের আহত নীসকেস ও উইমরিজ বারনেনের জন্য। তবে ওরা খেলবে ঠিকই। পোল্যাণ্ড সুবিধে করতে পারছে না। স্কটল্যাণ্ড তো প্রথম পর্যায়ের শেষে দেশেই ফিরে গেল। আমার মনে হয়, ইতালিই এবার বিশ্বকাপ নেবে। ওই দলে আছে দু'জন খেলোয়াড় যাদের আছে নাম ও দাম দুইই—পাওলো রসি ও রবার্টো বেটেগা। চলছে এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে লীগের খেলা।

গ্রীষ্মে সকালে স্কুলের ছেলেদের জন্য 'সামার ক্রিকেট' বলে একটা শব্দ চালু আছে। ক্রিকেট খেলাও হয়। যা'রা খেলোয়াড় তারাই দর্শক। কর্মকর্তা দুজন আম্পায়ার। ব্যস্, আর কারুর টিকি দেখতে পেলাম না। ইডেনও এবার খেলা হচ্ছে না। যে সব মাঠে খেলা হচ্ছে তা মোটেই সুবিধেজনক নয়। খেলোয়াড় নাকি তৈরি হবে এই স্কুল ক্রিকেট থেকে। হ্যাঁ, হবে কিন্তু তার জন্য কর্তৃপক্ষের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। এভাবে কোনোরকমে ট্রফি চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সকলেরই ফাস্ট্ বোলার হবার চেষ্টা। সকলেই যে হতে পারে না, এটা বলে দেবে কে? মাঠে বলে দেবার লোক নেই। ফাস্ট্ বোলিং-এর নামে এন্‌তার থ্রো বল হচ্ছে। এর বিষময় ফল ভুগতে হবে। গলদ গোড়াতেই থেকে গেলে শোধরানো সম্ভব নয়। দেখলাম তাই হচ্ছে। কোচ মশায়রা সব কোথায়? শুনলাম, স্টেটব্যাঙ্ক নিজের খরচে ফাস্ট বোলার তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পরিকল্পনার নমুনা দেখে স্রেফ থ বনে গেলাম। এখনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দরকার, না হলে কোনোদিনই ফাস্টবোলার কেন কোনো ক্রিকেটারই তৈরি হবে না।

★ পুরোন সন্দেশ নতুনের মতই মিষ্টি—তাড়াতাড়ি কিনে নাও ★

	সাধারণ	বাঁধানো
১৩৮১—(শ্রাবণ সংখ্যা নেই)	৭·৭৫	১০·০০
১৩৮২—(সম্পূর্ণ বছর)	১০·৭৫	১৩·০০
১৩৮৩— ,,	১২·৭৫	১৫·০০
১৩৮৪— ,,	১৩·৭৫	১৬·০০

শারদীয়া সংখ্যা—১৩৮৪—৩·০০, ৮৩—২·০০, ৮২—২·০০ '৮১—১·০০, ৭৫=১·০০

২, ৩ বা ৪ বছরের সন্দেশ কিনলে ১·০০, ২·০০, বা ৩·০০ এবং ২, ৩, ৪ বা ৫ বছরের শারদীয়া সংখ্যায় ১০০, ২·০০, ৩·০০ বা ৪·০০ রিবেট পাওয়া যাবে।

৫৫ পৃষ্ঠা থেকে—উত্তর—কোন পাখি?—বাজ, বক, পিক, ঘুঘু।

লেজ কাটলে?—গণ্ডার, ছাগল, হরিণ।

Every Mark 3 is Deluxe

with deluxe features that come as standard

Check for yourself—and compare

Features	Standard	Optional	Features	Standard	Optional
1. Elegant foam leather upholstery and door pads	✓		17. Indicator flasher light fitted on both front and rear	✓	
2. Twin sunvisors	✓		18. Wiper motor with twin arms and blades	✓	
3. Rich nylon carpet	✓		19. 6-ply white side wall tyre (In lieu of 4-ply black side wall tyre)	— —	Rs. 540.27*
4. Rear door mounted armrest metal finisher	✓		20. Courtesy light switch fitted on both front doors	✓	
5. Windshield glass moulding	✓		21. Dual tone horns	✓	
6. Floor Shift Gear	— —	Rs. 255.00*	22. Vacuum Servo Brake	— —	Rs. 260.10*
7. Backlight glass moulding metal finisher	✓		23. Torsion spring front suspension	✓	
8. Front ashtray	✓		24. Two glove boxes with lid on dash panel	✓	
9. Rear ashtray	✓		25. Rear Number plate light nickel chromium plated	✓	
10. Metal grille nickel chromium plated	✓		26. Hub-caps nickel chrome plated	✓	
11. Bucket type seats	— —	Rs.1,020.00*	27. Velvet door beading	✓	
12. Metal bumper nickel chromium plated	✓		28. Metal Horn Ring nickel chrome plated	✓	
13. Bumper Overrider	✓		29. Children's safety door locks	✓	
14. Right hand front door fitted with barrel lock handle	✓				
15. Decklid fitted with barrel lock handle	✓				
16. Windshield washer	— —	Rs. 26.78*			

Maximum Ex-Factory Retail Price* (inclusive of Excise duty). Local taxes and delivery charges extra. (Price is subject to change without notice).

AMBASSADOR Mk. 3 deluxe already

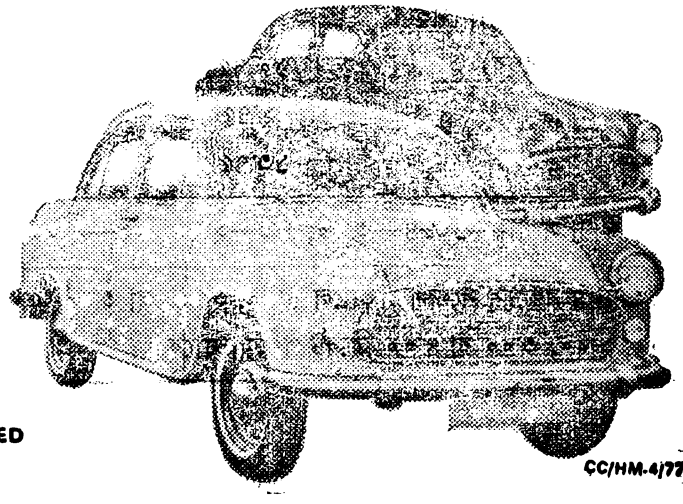

HM

HINDUSTAN MOTORS LIMITED
CALCUTTA

CC/HM-4/77

★ জোড়া-প্রতিযোগিতার ফলাফল ★

১। বোম্বাগড়ের আরো খবর

ক-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার-২০৲—১১৮৭ পরাগ বরণ পাল

দ্বিতীয় পুরস্কার-১০৲—১১৫৪ কোয়েল চৌধুরী

১০৲—২৩৪৯ সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায়

খ-বিভাগ—প্রথম পুরস্কার-২০৲—১২৪ অরুন্ধতী মজুমদার

২০৲—১৫৮১ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২০৲—২৫৮৯ অভিজিৎ দত্ত

এদের লেখাও খুব ভাল হয়েছিল—ক বিভাগ—৬৮৫ ঋতুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ-বিভাগ—২৯৫ শ্রেয়া দত্ত, ৮৮৬ ইবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাছাড়া, এত বেশি সংখ্যক লেখা বেশ ভাল হয়েছিল, যে নাম ছাপানো গেল না।

২। বোম্বাগড়ের ছবি—ক-বিভাগ—২০৲—১১৮৭ পরাগ বরণ পাল।

আমাদের মতে আর একটা ছবিও পুরস্কার পাবার উপযুক্ত হয়নি, তাই ছবির পুরস্কারের টাকাগুলোও ছড়া-লেখকদের ভাগাভাগি করে দেওয়া হল। পুরস্কার পাওয়া ছবি ও ছড়াগুলো শ্রাবণে ছাপা হবে।

★ অবাক করা প্রতিযোগিতা ★

কি জিনিস তোমাকে সব চেয়ে অবাক করে? কেন? ১৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে গুছিয়ে লেখো তো দেখি?

নিয়মাবলী

১। সতের বছরের কম বয়স্ক সব গ্রাহকই যোগ দিতে পারবে।

২। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরির ছাত্র, মেম্বাররাও ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে পারবে।

৩। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে। যে সব স্কুলের গ্রাহক নম্বর নেই তারা স্কুলের, সার্কেলের আর জেলার নাম লিখবে।

৪। যারা গ্রাহক নয় তারাও ৩১শে অগস্টের মধ্যে গ্রাহক হলে যোগ দিতে পারবে। যারা নম্বর পায়নি, তারাও 'নতুন' লিখে যোগ দেবে।

৫। ৩১শে অগস্টের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছন চাই।

৬। ক বিভাগে—যাদের বয়স ১২র কম—১ম ২০৲, এবং ২য় ১০৲

খ বিভাগে—বয়স ১২ বা তার বেশি কিন্তু ১৭র কম—১ম ২০৲ এবং ২য় ১০৲

দরকার হলে পুরস্কারগুলি ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে।

'... বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে'

ডানলপ ইণ্ডিয়া
দেশের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে অহোরাত্র ঠিক সুরটি বাজিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।
পরিবহন, কৃষি, শিল্প, প্রতিরক্ষা ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ডানলপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডানলপ ইণ্ডিয়া
প্রগতির পথিক

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫, ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
অশোকানন্দ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।